

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ইসমাত রুমিনা
সোনিয়া বেগম
গাজী হোসনে আরা
শামসুন নাহার বীথি
সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা
রেহানা ইয়াছমিন

সম্পাদনা

প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু
প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক গ্রণয়নে সমন্বয়ক

শাহান আরা হুদা

সৈয়দা মেহেরুন নেছা কবীর

কম্পিউটার কম্পোজ

পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

মোঃ হাসানুল কবীর সোহাগ

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মাদা বোধ জন্মিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের দৃপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইচ্ছিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

পারিবারিক বিজ্ঞান একটি জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা। এই বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অতীত লক্ষ্যে পৌছাতে, গৃহ ও গৃহের বাহিরে বিভিন্ন ঘটনা মোকাবিলা করতে এবং গৃহপরিবেশে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তোলে। এসব বিষয় বিবেচনা করে এবং সর্বোপরি সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে সুচিন্তিতভাবে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অতীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিশূল কর্মমজের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ট্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, সমন্বয়ক, মমুনা প্রমুখি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

| অধ্যায় | বিভাগ ও অধ্যায়ের শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|--|---|---------|
| ক বিভাগ : গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | | |
| প্রথম | গৃহ ব্যবস্থাপনা | ২-১০ |
| দ্বিতীয় | গৃহ ব্যবস্থাপক | ১১-১৭ |
| তৃতীয় | গৃহসম্পদ | ১৮-২৩ |
| চতুর্থ | গৃহসম্পদের ব্যবস্থাপনা | ২৪-৩৩ |
| পঞ্চম | গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা | ৩৪-৪৬ |
| খ বিভাগ : শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক | | |
| ষষ্ঠ | শিশুর বর্ধন ও বিকাশ | ৪৮-৫৯ |
| সপ্তম | শিশু বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ | ৬০-৭০ |
| অষ্টম | কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা-প্রতিকার ও প্রতিরোধ | ৭১-৭৮ |
| নবম | প্রতিকল্পী শিশু | ৭৯-৮৫ |
| গ বিভাগ : খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা | | |
| দশম | খাদ্যের কাজ ও উপাদান | ৮৭-১১০ |
| একাদশ | খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা | ১১১-১১৮ |
| দ্বাদশ | নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা | ১১৯-১২৭ |
| ত্রয়োদশ | খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন | ১২৮-১৩৯ |
| ঘ বিভাগ : বস্ত্র ও বয়ন তত্ত্ব | | |
| চতুর্দশ | বয়ন তত্ত্ব | ১৪১-১৪৯ |
| পঞ্চদশ | পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি | ১৫০-১৬০ |
| ষষ্ঠদশ | বস্ত্র ছাপা ও রং করণ | ১৬১-১৬৪ |
| সপ্তদশ | ড্রাফটিং | ১৬৫-১৬৯ |
| অষ্টদশ | পোশাকের যন্ত্র ও পারিপাট্যতা | ১৭০-১৮৪ |

ক - বিভাগ গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা—

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব
- গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা পর্দায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হব
- গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- গৃহ সম্পদের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সুষ্ঠুভাবে গৃহসম্পদ ব্যবহারে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব
- বাজেটের ধারণা, গুরুত্ব এবং বাজেট তৈরির নিয়ম বর্ণনা করতে পারব এবং পরিবারের জন্য মাসিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব
- সময় ও শক্তি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- কাজ সহজকরনের কৌশল বর্ণনা করতে পারব
- গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জার উপকরণ ও বিন্যাসের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- গৃহ সজ্জার নাস্পনিক দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করতে পারব
- অব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারব।

প্রথম অধ্যায় গৃহ ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা

সাইরা, আরিবা ও কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা একসাথে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভোর ৬.৩০মিনিটে শহীদ মিনারে যাবে। সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই মিলে পুষ্প অর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞানাবে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬.৩০ মিনিট পার হয়ে গেল। নাভাশার ঘুম ভাঙলো না। ঘুম থেকে জেগে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার আর শহীদ মিনারে যাওয়া হলো না। এক্ষেত্রে তার উচিত ছিল ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা অথবা বাবা-মাকে বলে রাখা যাতে তারা তাকে ছাগিয়ে দেন। বৃষ্টি, পরিকল্পনা ও সময়টাকে সে ভালোমতো কাজে লাগায় নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এখানে ওর মধ্যে কিছুর অভাব ছিল। বলতে পারো সেটা কি? সেটা হলো ব্যবস্থাপনা।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অমিতত্ত্ব লক্ষ করা যায়। গৃহে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানাবিধ কার্যকলাপে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবারে বসবাস করে প্রতিটি মানুষ তার কাক্সিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সে কাজের পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পরামর্শ করে কাজগুলো সংঘটিত করে, কাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অবশেষে কাজের ভালোমন্দ মূল্যায়ন বা যাচাই করে। তার এসব ধারাবাহিক কার্যকলাপের মধ্যেই গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিকলন ঘটে।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেমন ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য তেমনি গৃহকে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। একটি পরিবারকে তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার কতগুলো কাজ সম্পাদন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করে। যেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কোনো একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়, সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহ তথা পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

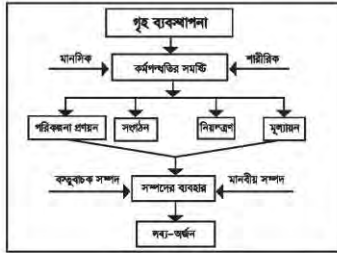
নিকেল ও ডরসি গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনযাপনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন যে, পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাহক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করা হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাকে বিস্তারিত করলে তিনটি বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন :

- কাক্সিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- সম্পদের সঠিক ব্যবহার
- সম্পদ ব্যবহারে ধারাবাহিক কর্মপন্থা-পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।

লক্ষ্য স্থির হওয়ার পর সব রকম সম্পদের ধারণা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। যেমন- কোনো কাজ করতে গেলে প্রথমে কাজের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এরপর পরিকল্পিত

কাজগুলোকে সংগঠিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শেষ ধাপে কাজের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে যে, কাজটি কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শেষ হলে, আরও নতুন উদ্দেশ্য স্থির হয় এবং তা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়।



গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো।

কাজ - গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামোটির একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর।

পাঠ ২ - লক্ষ্য ও লক্ষ্যের প্রকারভেদ

লক্ষ্য কী?

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যেখানে লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্ন রয়েছে সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাধারণভাবে বলা যায় ব্যক্তি বা পরিবার কী চায় বা কী করতে চায় তাই হচ্ছে লক্ষ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সব সময় মানুষের চেতন মনে অবস্থান করে, খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। সকল মানুষের মনে সর্বদাই কোনো না কোনো লক্ষ্য বিরাজ করে। একটি লক্ষ্য অর্জন হলেই আমরা নতুন কোনো লক্ষ্য স্থির করে ফেলি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমাদের কাজের ধারা নির্ধারণ করে দেয়, ফলে আমরা সে অনুযায়ী এগিয়ে যাই।

প্রতিটি পরিবার ছোট-বড় নানারকম লক্ষ্য পোষণ করে। সাধারণত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো পরিবার অর্থ উপার্জনকে বেশি প্রাধান্য দেয়, আবার কেউ সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে চায়, কেউ বা তার সদস্যদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়।

লক্ষ্য হচ্ছে একটি কাম্য উদ্দেশ্য, যার সুনির্দিষ্ট পরিধি আছে এবং যা ব্যক্তির কার্যবলিকে নির্দেশ দান করে। লক্ষ্যের নির্দিষ্ট পরিধি থাকতে হবে এ জন্য যে, কাম্য লক্ষ্যটি ব্যবস্থাপকের কাছে সুস্পষ্ট না হলে, তা অর্জন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলেই তা অর্জনের কার্যবলিও সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ লক্ষ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করে এবং তাকে সাফল্যের সাথে কার্যকর করতে সাহায্য করে। পরিবারের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে। তবে যখন সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ স্থির করা হয়, তখন লক্ষ্য কম হবে এবং লক্ষ্য অর্জনও সহজতর হবে।

লক্ষ্যের প্রকারভেদ

নিম্নলিখিত ৩ ভাগে লক্ষ্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

- দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য
- মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য
- তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে স্থায়ী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্য সময় সাপেক্ষ এবং এটা সর্বদা মনের মধ্যে বিরাজমান। এ লক্ষ্য মধ্যবর্তী লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য

পরিবার তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায়ই মধ্যবর্তীকালীন বা স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ লক্ষ্যগুলো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের তুলনায় অধিক স্পষ্ট। সেজন্য এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

এ লক্ষ্য হলো ছোট ছোট লক্ষ্য, যার মধ্যে খুব বেশি একটা কাজের প্রয়োজন হয় না। অল্প কাজ করলেই অনেক সময় লক্ষ্যটি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে সাথেই তা অর্জন করা যায়।

উদাহরণের সাহায্যে এ তিন প্রকার লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। সোমা নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়। এটা তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। সে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই সে এখনই যোগ্য টিউটরের সন্ধান করছে— এগুলো হলো সোমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সোমার নিয়মিত স্কুল-কলেজে যাওয়া, মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করা, শ্রেণির কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করা এবং ভালো রেজাল্ট করা এ সবই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কাছ – তোমার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির কর। সে লক্ষ্যে পৌছাতে হলে তোমার করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা করে দেখাও।

পার্শ্ব ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

গৃহ ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষেত্রে শুধু গৃহাঙ্কনেই সীমাবদ্ধ নয়। গৃহের বাইরের সমাজে ও পরিবেশে এবং কর্মক্ষেত্রে বিন্যস্ত। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব গৃহ ও পরিবারের উপর পড়ে। সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন আনা অথবা পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা গৃহব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিহিত রয়েছে।

আমাদের চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। এ অবস্থায় চাহিদাপূরণে পূরণ করতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য। দক্ষতা বাড়াতে হলে সম্পদের প্রকৃতি ও তার বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিবেচিত। বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন— পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদির মূল উৎস হচ্ছে পরিবার। পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ পরিস্থিতিতে ভোক্তা এবং ক্রেতা হিসেবে ব্যক্তি তথা পরিবারের কী অধিকার এবং অধিকার রক্ষায় কী করণীয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো কর্মমুখী আচরণ দ্বারা পরিবার তথা দেশের কল্যাণ সাধন করা। মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করতে পারে। এই সফলতাই পারিবারিক জীবনে কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সকল সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন।
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করা ও তা বিশ্লেষণ করা।
- গৃহ ও গৃহের বাইরে একটি সুষ্ঠু বাসোপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা।
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।
- দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
- ভবিষ্যতে নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের উপায় নির্ধারণ করা।
- পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করা।
- আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে গৃহস্থালির আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন করা।
- দূষণমুক্ত, বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যতে জ্ঞানসিকটের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে তা দূরীকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানের যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করে। গৃহ ও কর্মক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যা অনুধাবন করে, কীভাবে এর সাথে অভিযোজন করা বা খাপ খাওয়ানো যায় গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সে বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পাঠ ৪ – গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হতে শষ্ট ধারণা করা যায় যে, গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতগুলো ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির সমষ্টি মাত্র। এ পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় বলে এগুলোকে গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায় বলা হয়। পদ্ধতিগুলো হলো— পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন। প্রতিদিনের কাজে সচেতনভাবে এই ধাপগুলো আমাদের অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনের কাজের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে মূল্যায়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে। গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সংগঠক, নিয়ন্ত্রণকারী ও মূল্যায়নকারীরূপে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পরিকল্পনা

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ পরিকল্পনা করা। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তার পূর্বে কাজটি কীভাবে করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার নাম পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো পূর্ব থেকে স্থিরকৃত কার্যক্রম।

সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন—

- পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মতামত যাচাই করে এবং প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করতে হবে।
- বিভিন্ন কার্যকলাপে সফলতা লাভ করতে হলে সদস্যদের দক্ষতা, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, কাজ করার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি পরিকল্পনায় বিবেচনার বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং সঠিক পরিকল্পনা করতে হলে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।
- পরিকল্পনা এমন হতে হবে যেন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ নমনীয় হতে হবে। হঠাৎ করে কোনো জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সমাধান করার উপযোগী পরিবেশ যেন সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। তা ছাড়া পরিকল্পনা যত দূর সম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত।
- পরিবারের সকলের গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

সংগঠন

গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে স্বেচ্ছা সাধন করার নাম সংগঠন। সংগঠনের পর্যায় কোন কাজ কোথায় ও কীভাবে করা হবে তা স্থির করা হয়। সংগঠনের পর্যায় পরিবারের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে ইটিনাটি চিন্তা করে কোথায় কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে তা স্থির করা হয়ে থাকে। কাজ করতে গেলে-কোন কাজ কাকে দিয়ে করানো হবে, কার সে কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে, কীভাবে কাজটি করতে হবে, কী কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় কাজ, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। সংগঠনের তিনটি পর্যায় আছে—

- প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি করণীয় কাজের বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিক বিন্যাস রচনা করে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের কোন কাজ আগে এবং কোন কাজ পরে হবে তার ধারাবাহিকতা রচনা করে।
- তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কাজসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করার জন্য একটি কর্ম কার্টামো রচনা করে।

সুতরাং বলা যায়, যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সফল।

নিয়ন্ত্রণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় পরিবারের সকল ব্যক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের কাজে নিয়োজিত কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। পরিকল্পিত কর্মসূচি ও পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত সংশোধনীর ব্যবস্থা করা এ পর্যায়ের কাজ।

কাজ চলাকালীন অবস্থায় কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, যাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সে কাজ সঠিকভাবে করছে কি না ইত্যাদি। প্রয়োজনবোধে কাজের ধারা পরিবর্তন করে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতোগুলো স্তরে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয় যেমন—

- **কর্মে সক্রিয় হওয়া**— প্রথম স্তরে কাজে উদ্যোগ নেওয়া বা সক্রিয় হয়ে কাজ করা বোঝায়। কাজের উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করাটাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে জানা থাকলে কাজ আরম্ভ করা সহজ হয়।
- **পর্যবেক্ষণ করা**— কাজ করার দ্বিতীয় স্তরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে হয়। কাজটি করতে সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে কি না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী রকম সাফল্যের সঙ্গে হচ্ছে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কাজ চলাকালীন অবস্থায় এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
- **অভিযোজন করা/খাপ খাওয়ানো**— নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয় অথবা কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবিলা করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহীত পরিকল্পনায় কিছুটা রদদল করে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হচ্ছে অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়ন

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সর্বশেষ পর্যায় হলো মূল্যায়ন করা। কাজের ফলাফল বিচার বা যাচাই করাই হচ্ছে মূল্যায়ন। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে। কাজটি করার পেছনে যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জনে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর অবদান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছাড়া কাজের সফলতা ও বিফলতা নিরূপণ করা যায় না। কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ফলাফল যাচাই করতে হয়। উদ্দেশ্য সাধিত না হলে ফলাফল ভালো হলো না বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। মূল্যায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হলো কি না, আর যদি হয়ে থাকে, কতোটা হলো তা পরিমাপ করা যায়। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করে পরবর্তীতে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। সঠিক

মৃত্যুগমনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

- লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত কাজগুলো ঠিকমতো হয়েছে কি না
- কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করা
- কাজে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে পরবর্তীতে সম্ভাব্য শ্রমের মাধ্যমে কাজে সফল হওয়া।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করে একটি পিকনিকের আয়োজন করা।

পাঠ ৫- সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর প্রতিটি স্তরে বা ধাপে ছোট-বড় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। গ্রন্থ এবং ক্রান্তিলের মতে—সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হলো সমস্যা সমাধানে একাধিক কার্যক্রম বা পন্থা থেকে একটি বিশেষ কার্যক্রম পছন্দ করা। পরিবার যে কোনো সময় পরিবর্তিত অবস্থার বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প পন্থা থেকে সবচেয়ে উত্তম পন্থাটি বেছে নেওয়াটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবার কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতির উপর। পরিবারের ছোটখাটো অনেক সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কোনো সূজনশীল কাজে বা কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে কাজটির জন্য বিকল্প উপায়ে একজন ব্যক্তির তুলনায় দলগত প্রত্যাবেশি কার্যকর। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে গ্রহণ করাই উত্তম। এতে কাজটি সুন্দর হয় এবং ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বা পর্যায়

যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কতগুলো ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে পর্যায়ক্রমে এগুলো অনুসরণ করতে হয়। এ পর্যায়গুলো হলো—

- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি
- বিকল্প অনুসন্ধান
- বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা
- একটি সমাধান গ্রহণ
- গ্রহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ
- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি – সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে যে সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তার প্রকৃতি নির্ণয় করা। সমস্যার স্বরূপ অবগত না হলে সঠিক সমাধান আশা করা যায় না। সমস্যা কখনো সাধারণ আবার কখনো কঠিন বা জটিল হতে পারে। সাধারণ ছোটখাটো সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু কঠিন সমস্যায় অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।
- সমস্যা সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধান – সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থাগুলো অনুসন্ধান করা হয়। যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বিকল্প পন্থা থাকতে

পারে। বিকল্প পন্থাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে সঠিক পন্থা নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দূরবর্তী কোনো স্থানে ভ্রমণে যেতে কী ধরনের যানবাহন নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত হবে তা যাচাই করতে হবে। অর্থ, সময়, শক্তি ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহারের আলোকে বিকল্প ব্যবস্থাগুলো যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়।

- **বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা**— এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থাগুলো বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি বিকল্পের ফলাফল, এর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখতে হয়। যেমন— সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, বার ফলে কাল্পনিক ফলাফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। অনেক সময় সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে সময় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় কোন বিকল্প সমাধানটি বেশি কার্যকর। সিদ্ধান্তের এ পর্যায়ের জন্য প্রথম চিন্তাশক্তির প্রয়োজন।
- **একটি সমাধান গ্রহণ**— সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তর হচ্ছে অনেকগুলো বিকল্প পন্থার মধ্য হতে একটি পন্থা বেছে নেওয়া। এ স্তরটি খুবই প্রত্যাবলী। এটা মানুষের সমস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদিও একটি যুক্তিপূর্ণ বিকল্প ঝুঁজে নেয়, তবুও তারা সবচেয়ে ভালো পন্থাটা নির্বাচনের জন্য খুব কমই চেষ্টা করে। সময় এবং পারিবারিক অবস্থার দ্বারা মানুষ অনেক সময় প্রভাবিত হয়। যেমন— দোকানে সুন্দরভাবে সাজানো জিনিসপত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ে সে দ্রব্য কেনাকাটা করে ফেলতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর বয়স, চাহিদা, আয় ইত্যাদির উপর একটি সমাধান গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভর করে। একটি সমাধান গ্রহণের সময় দেখতে হবে তা যথেষ্ট কার্যকর কি না এবং এতে মন পরিতৃপ্ত হবে কি না।
- **গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ**— যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তার ফলাফল জেনে দায়িত্ব গ্রহণ করাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বশেষ পর্যায়। গৃহীত সিদ্ধান্তটির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুবা পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্তরায় বিকল্প বাছাইকরণের পর যে সমাধান গ্রহণ করা হলো তা কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন যার সাথে পরিবারের সকলের সুসম্মত বিদ্যমান এবং যিনি যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন।

কাঙ্ক্ষা — পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত ও দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ভুলে ধর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে কে অভিহিত করেছেন—

ক) নিকেল ও গ্রস

খ) গ্রস ও ক্রাভেল

গ) ক্রাভেল ও নিকেল

ঘ) নিকেল ও ডরসি

২। গৃহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রধানত কোনটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক) লক্ষ্য | খ) পরিকল্পনা |
| গ) নিয়ন্ত্রণ | ঘ) মূল্যায়ন |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনোয়ারা জামান একজন গৃহিণী। পারিবারিক স্বচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে তিনি মুরগির ফার্ম খোলার পরিকল্পনা করেন। প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করে তিনি কর্মী নিয়োগ করেন। মাসখানেক পর তিনি ফার্মে এসে অনেক অব্যবস্থাপনা দেখতে পান।

৩। মনোয়ারা জামানের কর্মপন্থাভিত্তে কোনটির অভাব লক্ষ্য করা যায়?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক) উদ্যোগ | খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ |
| গ) সংগঠন | ঘ) নিয়ন্ত্রণ |

৪। মনোয়ারা জামানের করণীয় ছিল —

- পরিকল্পনা করা।
- উদ্যোগ নেওয়া।
- কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সায়হাম নবম শ্রেণির ছাত্র। ভবিষ্যতে সে একজন চিকিৎসক হতে চায়। বাবা মা লক্ষ্য করছেন সায়হাম প্রায়ই স্কুলে যেতে চায় না। পড়াশোনায়ও তেমন একটা আগ্রহ নেই। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিক আলোচনা শেষে সায়হামের মাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি কোনটি?

খ. কীভাবে লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয় তা বুঝিয়ে লেখ।

গ. সায়হামের কার্যকলাপে কোন ধরনের লক্ষ্যের ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সায়হামের পরিবারের সদস্যদের পদক্ষেপ মূল্যায়ন কর।

২। আজ খাদিজা খাতুনের ছোট মেয়ের জন্মদিন। হঠাৎ করে এ উপলক্ষে অতিথিদের আপ্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী অসুস্থ থাকায় তিনি স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে বাজারের দায়িত্ব দেন। ঘরকুনো স্বভাবের বড় মেয়েকে তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব দেন। অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি নিজে সার্বক্ষণিক তদারকি করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আরও কৌশলী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?

খ. গৃহ ব্যবস্থাপনা কলতে কী বোঝায়?

গ. খাদিজা খাতুনের ত্রুটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আয়োজক হিসেবে খাদিজা খাতুনের কাজের ধাপগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় গৃহ ব্যবস্থাপক

পাঠ ১ – গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

প্রতিটি মানুষ কতোগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানুষের জীবনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহের ভূমিকা অপরিণীম। পরিবারের সব সদস্যের আন্তরিক ইচ্ছা, একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে গৃহেই পরিবারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ও দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপনার। সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি সাধারণ গৃহকেও অনন্য সাধারণ করে তুলতে পারে। আর যিনি গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে থাকেন, তিনি হলেন গৃহ ব্যবস্থাপক। পরিবারের মা-বাবা উভয়েই এই ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। গৃহ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন গৃহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তার ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে পারিবারিক সুখ-শান্তি, স্বচ্ছলতা, সুশৃঙ্খল গৃহপরিবেশ। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ নিকেল ও ডরসি (Nickel and Dorsey, 1950) গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। গৃহ ব্যবস্থাপক তার শক্তি, সামর্থ্য ও বিভিন্নমুখী দক্ষতার জোরে এ প্রশাসনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলে। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে অবশ্যই কতোগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। এই গুণগুলো হলো—

| | |
|-------------|-----------------------------|
| বুধিমত্তা | উদ্দীপনা |
| বিচারবুদ্ধি | ব্যক্তিত্ব |
| অধ্যবসায় | সৃজনীশক্তি |
| আত্মসম্মতি | অভিযোজ্যতা |
| | মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান |

বুধিমত্তা— একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুধিমান হতে হয়। ব্যক্তির পূর্বেবর্ণন ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা, জ্ঞানসূত্র ইত্যাদি তার বুধিমত্তার পরিচয় দেয়। কোনো সমস্যাকে অনুধাবন করে পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করা, বিগত দিনের কোনো অভিজ্ঞতাকে সমন্বয়িত করে কাজে লাগানো এ সবই বুধির উপর নির্ভরশীল। পারিবারিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সফল করার জন্য ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুধিমান হতে হবে। গৃহের সৌন্দর্যবর্ধনে, শৃঙ্খলা আনয়নে, যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুধিমত্তার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক তার বুধির জোরে পরিবারের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেও সব চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

উদ্দীপনা— গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ হলো উদ্দীপনা। উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা আসে না। যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টাকেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলা যেতে পারে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি অন্য সদস্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। উদ্দীপনা থাকলে অগ্রাহ ও আনন্দের সাথে সব কাজ সম্পন্ন করা যায়। আবার দেখা যায় উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয় না।

বিচারবুদ্ধি— সত্যের ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ রায় দেওয়ার সামর্থ্য যার ভালো, তাকেই বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিচার-বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম জটিলতা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক। সেসব জটিলতা

সমাদান করাও সহজ হয় যদি গৃহ ব্যবস্থাপকের তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা থাকে। পরিবারের প্রয়োজনে কোন জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোন জিনিসটি না হলেও চলে এসব ভেবে দেখা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবারের ছোট শিশুটিকে কোন স্কুলে ভর্তি করানো যায়, সে স্কুলের মান, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

ব্যক্তিগত— মানুষের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণে ও রুচি বোধে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে তিনি পরিবারের সকলের নিকট পছন্দনীয় হতে পারেন তার মার্জিত ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তায় শালীনতা ও পরিমিত বোধ, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণাবলি থাকতে হবে।

সৃজনীশক্তি— গৃহ পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হলে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হয়। সেটিই সৃজনশীলতার প্রতীকরূপে সবার নজরে পড়ে। গৃহ ব্যবস্থাপককে এ রকম সৃজনশক্তির অধিকারী হতে হয়, যিনি তার কল্পনাশক্তি দিয়ে নতুনত্ব তৈরি করতে পারেন। সৃজনশক্তির সাহায্যে গৃহ ব্যবস্থাপকের যে কোনো কাজের পরিবর্তন করা সহজ হয় এবং কাজের ফলাফল কী হতে পারে সে সম্বন্ধে আন্দাজ করতেও কোনো অসুবিধা হয় না। পূর্ব নির্ধারিত কোনো কাজে যদি পরিবর্তন করতে হয়, তাতেও সৃজনশক্তি প্রয়োগ করে, তা সহজে করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গৃহ পরিবর্তনের কারণে নতুন ঘরের আসবাবপত্র নির্বাচন, ক্রয় ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক তার সৃজনশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন।

অধ্যবসায়— অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শেষপর্যন্ত কাজটি করে যাওয়াটাই হচ্ছে অধ্যবসায়। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণের কারণেই যে কোনো কঠিন কাজও সহজেই সম্পন্ন হয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলী অধ্যবসায়ী হতে সাহায্য করে। যেমন বিশেষ কোনো নতুন কাজ যদি একবারে রপ্ত করা না যায়, তাহলে বারবার চেষ্টা করে তা রপ্ত করা যায়। গৃহের নানাবিধ কাজের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি থাকা আবশ্যিক। ঘরে শিশুদের পরিচালনা এবং তাদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অভিযোজ্যতা— পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাস করার কারণে প্রায়ই আমাদের নানা রকম পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। যেকোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজ্যতার গুণটি প্রত্যেক গৃহ ব্যবস্থাপকের থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বাড়িতে থাকলে তার বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অথবা চিকিৎসকের নির্দেশে হাসপাতালে নিতে হতে পারে। এ রকম পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অভিযোজন করে যাবতীয় কাজ সমাধা করতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপককে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। যিনি যত ভালোভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, তিনি যে কোনো পরিস্থিতি সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন।

আত্মসংযম— স্বাভাবিকভাবে জীবন চলার মাঝে পরিবারে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। পারিবারিক সংকেটকালো নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আত্মসংযম। একজন সুব্যবস্থাপকের আত্মসংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই গুণের মাধ্যমে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়। আত্মসংযম ক্ষমতা থাকলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সহজ হয়। পরিবারে অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে নানা রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপক উদ্বেজিত না হয়ে নিজেকে সংযত রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। ফলে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

মানবশ্রুতি সম্পর্কে জ্ঞান – মানব চরিত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ। প্রতিটি মানুষই বিভিন্নভাবে একে অন্য থেকে আলাদা। পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বভাব, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, মেজাজ-মর্জি ইত্যাদি এক রকমের হয় না। পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে পরিবারের সকল সদস্যের সামগ্রিক আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান প্রয়োজন। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের দ্বারা মানবশ্রুতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। ফলে তিনি সদস্যদের ঘরোয়া উদ্ধৃত যে কোনো সমস্যা সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। পরিবারে শিশুরা যেমন স্নেহ-ভালোবাসা চায়, তেমনি বড়রা চান শ্রদ্ধা-ভক্তি। আবার শিশুদের নির্দেশ দিয়ে কাজ করাতে হয়, পক্ষান্তরে বড়দের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয়। এতে পরিবারে শৃঙ্খলা, শান্তি বজায় থাকে।

উপরোক্ত গুণগুলোর সমন্বয়ে একজন গৃহব্যবস্থাপক উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে সবাই মান্য করে এবং তাঁর প্রতি সহযোগী মনোভাব পোষণ করে। ফলে তিনি যে কোনো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সফল হন।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ২ – গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহ ব্যবস্থাপকের নানাবিধ গুণ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি। পরিবারে বিভিন্ন রকম কাজ থাকে। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক তার করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার গুণাবলির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারেন। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাকে সব সময় সচেতন থাকতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সামান্য অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবারের ছোট-বড়ো কাজ থেকে বড় রকমের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালনের ভারও গৃহব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকে। তাকে পরিবারের সার্বিক কাজের দায়িত্বে থাকতে হয়। সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করানো গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার সঠিক নির্দেশনা পেলে অন্য সদস্যরাও কাজে অগ্রসর হয়ে উঠে।

পরিবারের সীমিত সম্পদের সদ্যবহার করে কীভাবে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা মেটানো যায়, গৃহ ব্যবস্থাপকের তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাজগুলো কে করবে, কীভাবে করা হবে, কখন এবং কেন করা হবে এসব বিষয়ের প্রতি সচেতন হয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বণ্টন করে, তার সার্বিক তদারকি করাটাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবারে গৃহব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- গৃহে সুষ্ঠু কর্মব্যবস্থা সৃষ্টি করা
- পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- পরিবারের সুষ্ঠু নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু ভোগ আচরণ গড়ে তোলা
- কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা।

গৃহে সুস্থ কর্ম ব্যবস্থা সৃষ্টি করা- পরিবারিক কাজগুলো সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া গৃহ ব্যবস্থাপকের অন্যতম দায়িত্বের অন্তর্গত। পরিবারে এমন অনেক কাজ আছে যা গৃহের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। যেমন-রাঁদা ও পরিবেশন করা, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা, কাপড় ধোওয়া, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সাহায্য করা, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা, চিকিৎসিনাদের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আবার কিছু কাজ বাড়ির বাইরে করতে হয়। যেমন-বাজার করা, সড়িতে যাওয়া, বাগান করা, আত্মীয়স্বজনের সৌজ খবর নেওয়া ইত্যাদি। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের শক্তি, সামর্থ্য, বয়স, কর্মসূহ ইত্যাদির ভিত্তিতে কাজগুলোকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বণ্টন করে থাকেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজগুলোর তদারকি করা ও সদস্যদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা- পরিবারে সকলের সব রকম চাহিদা পূরণের জন্য আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। আয়ের মাধ্যমে পরিবার যে অর্থ উপার্জন করে তার ঘরাই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করা হয়। আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে পরিবারে অভাব-অভিযোগ থাকে না। ফলে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

আয়কে যথাযথভাবে ব্যবহারের প্রতিও গৃহব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। আয় অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য তাকে অর্থ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা করতে হয়, যা বাজেট হিসেবে পরিচিত। পরিবারের সীমিত আয়ের মধ্যে সুস্থ ক্রয় নীতি অনুসরণ করে পরিবারের সব রকম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। তার সুস্থভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনার ফলে, পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ব্যয় করার সদস্যসহ গড়ে উঠে, তারা মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী মনোভাব সম্পন্ন হতে পারে।

পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা - পরিবারে বিভিন্ন বয়স ও সম্পর্কের সদস্যরা অবস্থান করে। গৃহ ব্যবস্থাপনার সাথে একাধিক কাজ সম্পৃক্ত থাকে। পরিবারের সকল সদস্যের মিলিত প্রচেষ্টায় কাজগুলো সম্পন্ন হয়। সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক যদি ভালো হয়, তাহলে সেখানে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে অন্যান্য সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। এ ছাড়াও অন্য সদস্যরাও যেন একে অন্যকে শ্রদ্ধা করেন, মর্যাদা দেন সে বিষয়েও তাকে সচেতন থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে, সেগুলো সম্ভাব্য সহজ উপায়ে মিটানোর পদক্ষেপ নিতে হয়। অনেক সময় পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির সাথে নবীনদের মতের অমিল থেকে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রবীণ ও নবীনদের প্রকৃতি অনুধাবন করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। সকল সদস্যের যুক্তিসংগত চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারলে গৃহ ব্যবস্থাপকের সাথে তাদের সম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে।

পরিবারের সুস্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা - গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। গৃহ, গৃহের সদস্যগণ এবং পশুসামগ্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। গৃহ যাতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, পরঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও ময়লা আবর্জনা যথাযথ স্থানে অপসারণ করা, গৃহকে দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদি গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গৃহব্যবস্থাপকের। গৃহের সকল সদস্যের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। বাড়িতে সদস্যরা কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে, তাকে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিপজ্জনক প্রবাসামগ্রী নিরাপদ স্থানে

সত্রক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে তার সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য গৃহে সূত্র সত্রক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুস্থ ভোগ আচরণ গড়ে তোলা – বর্তমান যান্ত্রিক জীবন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বেড়েছে। পরিবর্তনশীল জগতের সাথে মিল রেখে সন্তানদের মানসিক বিকাশ হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে হয়। সেজন্য বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা সমূহ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে ভোগ করতে পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। এ ছাড়া সদস্যদের অনু, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণে সঠিক পণ্য নির্বাচন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য নির্বাচন সুস্থ হতে হবে, বস্ত্র নির্বাচন প্রয়োজন ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে হতে হবে, বাসস্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাতে সাধের মধ্যে সদস্যদের চাহিদাপূরণ পূরণ হয়। গৃহের সীমিত সম্পদের উপযোগ বা অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িয়ে কীভাবে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো যায়, সে প্রচেষ্টা গৃহ ব্যবস্থাপককে নিতে হবে।

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা – পরিবারের সকল সদস্য যেন তাদের করণীয় কাজগুলো তাগোভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সেজন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। কাজের পরিবেশ উন্নত ও আরামদায়ক হলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন— লেখাপড়া করার জন্য যথেষ্ট আলো-বাতাস পূর্ণ এবং কোলাহলমুক্ত একটি স্থানের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বই-খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গোছানো থাকলে সহজেই সেগুলো ব্যবহার করা যায়। এ রকম পরিবেশে নির্বিঘ্নে ও আরামদায়ক অবস্থায় লেখাপড়া করা যায়। একইভাবে প্রতিটি কাজ অনুযায়ী কাজের ভালো পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে গৃহ ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব নিতে হয়।

উপরোক্ত কাজের দায়িত্ব পালন ছাড়াও গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারে আরও অনেক অনুষ্ঠান, উপলক্ষ ও বিভিন্ন ঋতুর সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে হয়। আর সেসব কর্মকাণ্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে ব্যবস্থাপককে বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে, গৃহ ব্যবস্থাপক গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব বহন করেন। তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য। তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, তার আদেশ, নির্দেশ পালন করে সবাই মিলে পারিবারিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো গৃহ ব্যবস্থাপকের সুচালু ব্যবস্থাপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি যাতে এ রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সফল হতে পারেন সেজন্য প্রত্যেক সদস্যকে যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তাহলেই আশা করা যাবে যে, সুস্থ গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিবার তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

কাজ – তোমার পরিবারের গৃহ ব্যবস্থাপককে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ভূমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার? তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখ।

পাঠ ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা সামাজিক রীতিনীতি, মতাদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায় এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠে। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের এবং নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত করে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখতে পারেন। যেমন—

লিও ক্লাব, গার্ল গাইড, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদিতে সম্ভুক্ত হয়ে বিভিন্ন দুর্যোগাকালীন আর্ড মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারে সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ব্যবস্থা নিতে পারেন। শিষ্টাচার, আদর্শ মূল্যবোধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সুনামের হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। পরমতসহিষ্ণুতা, বিপদে ঐর্ধ্যধারণ, অন্যকে সাহায্য করা, সমাজস্বীতি শিক্ষা দানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের নৈতিক চরিত্রে অধিকারী করতে পারেন। এতে সামাজিক অবক্ষয়তা রোধের পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ রোধ করা সম্ভব হবে।

গৃহ ব্যবস্থাপক মা-বাবা যিনি হোন না কেন তাকে পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ-ভালবাসা শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ববোধ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হয়। যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ঈদ, পূজা, বড়দিন, মৃত্যুবার্ষিকী, অসহায় ও দুস্থদের সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গৃহ ব্যবস্থাপক জাতি, জাতীয় অনুষ্ঠান, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। আর যখন গৃহ ব্যবস্থাপক সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন তখন গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব পালন যথাযথ হয়েছে বলে মনে করা হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কাজে সফলতা অর্জনের জন্য কোন গুণটি থাকা প্রয়োজন?

- | | |
|----------------|--------------|
| ক) বিচারবুদ্ধি | খ) সৃজনশক্তি |
| গ) অধ্যবসায় | ঘ) উদ্দীপনা |

২। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক আত্মসময় গুলের অধিকারী হলে—

- পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকে।
- পারিবারিক সমস্যা সমাধান সহজ হয়।
- সদস্যদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সায়মার বড় ছেলোটিকে অবসরে ঘরে বসে টিভি দেখে ও গল্পের বই পড়ে। আর ছোট ছেলোটিকে সময় পেলেই বাসার পাশের মাঠে খেলতে চলে যায়। একদিন সায়মা বড় ছেলেকে দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনে আনতে বললে সে বিরক্ত হয়ে যায়।

৩। সায়মার মধ্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে?

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ক) মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান | খ) অভিযোজ্যতা |
| গ) বিচার ক্ষমতা | ঘ) বুদ্ধিমত্তা |

৪। উক্ত গুণ অর্জনে সায়মার করণীয় কোনটি?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ক) সম্মতানদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা | খ) সম্মতানদের আদর করা |
| গ) ধৈর্য ধারণ করা | ঘ) নিজেই কাজটি করা |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। স্বামী-সম্মতান নিয়ে সানজিদা খাতুনের সুখের সংসার। সম্মতানদের লেখা-পড়ায় ভালো ফলাফল থাকত। অন্য বিভিন্নভাবে তিনি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তবে বাসায় মেহমান এলে তাদের যত্ন ও আপ্যায়ন করতে তিনি প্রায়শ বিরক্ত হন।

ক. গৃহে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কে?

খ. গৃহে সুষ্ঠু কর্ম-ব্যবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সম্মতানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সানজিদা খাতুনের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সানজিদা খাতুনের মেহমান আপ্যায়নের বিষয়টি দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্য কি না – বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায় সম্পদ

পাঠ ১ - ২ সম্পদ ও সম্পদের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি পরিবারেরই কিছু না কিছু সম্পদ থাকে। এই সম্পদ দ্বারা পরিবার সূঁহ, সুপার এবং স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। একটি পরিবারের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ এবং এই মানব সম্পদ অপরাপর বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অনেকের অর্থ, জমা-জমি, বাড়ি-ঘর নাও থাকতে পারে কিন্তু একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, সময় ও শক্তি ইত্যাদি দ্বারা অর্থ সম্ভাব্য পথ সুপ্রস্তুত হয় এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে পরিবারের বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

প্রতিটি পরিবারে দেখা যায় গৃহকর্তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা পরিবারের অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আর গৃহকর্তা যদি অর্থ উপার্জন নাও করেন তবুও তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মভৎপরতা দ্বারা অর্থকে সূঁহভাবে পরিচালনা করে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন এবং অন্যান্য সম্পদও বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন।

‘সম্পদ’ গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ। সম্পদ ছাড়া লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে যেসব বস্তু বা সেবা সামগ্রী মানুষের অভাব মোচনে সহায়ক এবং যার বিনিময়মূল্য আছে তাই সম্পদ। কিন্তু গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে যা দ্বারা পরিবার সফল চাহিদা পূরণ করে এবং অভিজ্ঞ লক্ষ্য অর্জন করে তাই সম্পদ। যেমন: অর্থ, জমি, বাড়ি, গাড়ি, গৃহের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং শক্তি, সময়, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সূঁহরাং আমরা বলতে পারি, যা ব্যবহার করে আমরা তৃপ্ত হই, আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে, অভাব দূর করতে পারে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই সম্পদ।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য— সম্পদ আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণের হাতিয়ার। সম্পদ ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : ১. উপযোগ (Utility) ২. আয়ত্তাধীন (Accessibility) ৩. সীমাবদ্ধতা (Limitation) ৪. পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability) ৫. পরিচালনা যোগ্যতা (Manageability)

১. **উপযোগ (Utility)**— মানুষের অভাব মোচনে পণ্যের ক্ষমতাই হলো উপযোগ। যেসব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে সেসব দ্রব্যসামগ্রী মানুষ পেতে চায়। কারণ উপযোগ বিশিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটাতে সক্ষম হয়। তাই গণ্য বা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগ।

শিক্ষা, বৃদ্ধি, স্থান, সময়, আকার, স্বাদ ও সূঁজনশীলতার উপর উপযোগ নির্ভর করে। যেমন—শিক্ষার ক্ষেত্রে বইয়ের উপযোগ বেশি। স্বস্ত্র মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরিতে পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান ও বৃদ্ধির উপযোগ বেশি। শ্রীষের সময় পানির ও পাখার উপযোগ বেশি। আবার যখন ক্ষুধা পায় তখন খাদ্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। পিপাসা পেলে পানির উপযোগ বৃদ্ধি পায়। আবার একটা দ্রব্যের উপযোগিতা সবার কাছে এক রকম নয়। যেমন : যে পান খায় তার কাছে পানের উপযোগ বেশি কিন্তু যে পান খায় না তার কাছে এর কোনো উপযোগ নাই।

চারটি উপায়ে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় —

ক. **আকৃতির পরিবর্তন করে** — যেমন : চাউলকে লিখ করে ভাত রান্না করা হয়, যখন গুঁড়া করে পিঠা তৈরি করা হয় তখন এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

খ. সমন্বয়যোগ্য ব্যবহার করে – আমরা ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করি, যদি জমি বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারি তবেই অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

গ. স্থানান্তরকরণ দ্বারা – সম্পদের উপযোগ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। যেমন – রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর আম উৎপন্ন হয়। এই আম অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তর করে আমের উপযোগ বাড়ানো হয়।

ঘ. চাহিদা মেটানোর দ্বারা – একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জিনিসের চাহিদা অনেক প্রকট থাকে। যেমন: পিপাসা পেলে পানির চাহিদা প্রকট। পরীক্ষার সময় কাগজ ও কলমের চাহিদা প্রকট।

২। **আয়ত্তাধীন (Accessibility)**– সম্পদ আয়ত্তাধীন হতে হবে। সম্পদ ব্যবহার করতে হলে আয়ত্তাধীন বা মালিকানাধীন হতে হবে। অন্যের অর্থ নিজের খুব কমই কাজে লাগে। সম্পদ নিজের আয়ত্তাধীন না হলে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্যের সম্পদ যদি ধার নেওয়া যায় বা কেউ দান করে তখনই অন্যের সম্পদ কাজে আসে। সম্পদের আয়ত্তাধীন মালিকানা সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণগত দিক নির্ভর করে সম্পদের ব্যবহারের উপর। যেমন– জমির উর্বরতা যত বাড়ানো যাবে মালিক তত লাভবান হবে। ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে না পারলে পরে সে অর্থ ভতটা কাজে আসে না।

কিছু কিছু সম্পদ আছে যা আয়ত্তা বা অর্জন করার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। যেমন : দক্ষতা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি।

৩। **সীমাবদ্ধতা (Limitation)** সীমাবদ্ধতা সম্পদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্পদ গুণগত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন : শক্তি গুণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ এবং সময় পরিমাণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ।

তবে কোনো সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্থিতিস্থাপক। যেমন : শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ দেন, তখন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একই শ্রেণিকক্ষের সকলে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতার জন্য সমান জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সময়ের সীমাবদ্ধতা সর্বজনীন। আবার শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য ঘটে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দ্বারা সময় ও শক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability)**

সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল। পরস্পর পরিবর্তন আমরা কয়েকটি ভাবে করতে পারি।

- **বিকল্প সম্পদ ব্যবহার :** বিকল্প বলতে একটার পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার বোঝায়। যেমন : ভাতের পরিবর্তে রুটি খাওয়া। পরিবেশ রক্ষার জন্য পলিথিনের পরিবর্তে কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা ইত্যাদি।
- **বহুবিধ ব্যবহার :** একই সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন : খাবার টেবিল – চেয়ারকে পড়শোনা, আলোচনা, কাপড় ইস্ত্রি করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যায়।
- **বিনিময় :** সম্পদ বিনিময়যোগ্য। যেমন : টাকার বিনিময়ে পণ্য ক্রয়।
- **স্থাপান্তরযোগ্য –** একটা সম্পদকে আর একটি সম্পদে স্থাপান্তর করা যায়। যেমন : পুরনো শাড়ি দিয়ে কাঁথা, ঘরের পর্দা, শিশুর জামা তৈরি করা। এতে সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।
- **সৃষ্টি –** একটা সম্পদ ব্যবহার করে অন্য সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। যেমন– জমিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করা। বাড়ির ছাদে সবজি উৎপাদন করা।

৫। পরিচালনা যোগ্যতা (Manage ability)

সম্পদের সূচী ব্যবহারকেই পরিচালনা বলা হয়। মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবেই হোক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যেমন— বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সময়, জ্ঞান, দক্ষতা, অর্থ ইত্যাদি সম্পদের ব্যবহার করা হয়। এসব সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন— পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়।

সম্পদের পরিচালনা যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা উপকৃত হই। যেমন—

- লক্ষ্য অর্জন করা যায়
- সম্পদ বৃদ্ধি পায়
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে
- অভাব ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা মোকাবিলা করা যায়
- পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় ইত্যাদি।

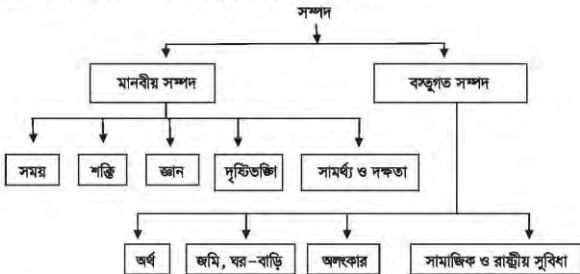
কাছ – ‘সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল’ এই বৈশিষ্ট্যটি দুর্যোগকালে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় উদাহরণসহ লেখ।

পাঠ ৩ – সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী। তাই সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ও সম্পদকে সূচীভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্পদের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

- ১। মানবীয় সম্পদ ২। বস্তুগত সম্পদ



১। মানবীয় সম্পদ – যা মানুষের গুণ, চর্চা বা অনুশীলনের মধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন : সময়, বিদ্যা, শক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান ইত্যাদি। প্রতি পরিবারে একাধিক সদস্য থাকে। প্রত্যেক সদস্যের

সামর্থ্য অনুযায়ী সময়, শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতার যদি সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তবে পরিবারটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা, পারদর্শিতা, মনোভাব গৃহ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে এবং অমানবীয় বা বস্তুবাক্য সম্পদের অপচয় হ্রাস করে এবং সমৃদ্ধি ঘটায়। যেমন— বাজেট করে চলা। বাজেট করে চললে অর্ধেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। অর্ধের অপচয় হ্রাস পায়।

আবার সময় তালিকা করে চললে সব কাজ সময়মতো শেষ করে জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়। গৃহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধিতে মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব অপরিণীম। নিম্নে মানবীয় সম্পদগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

সময় (Time) – পার্থক্য অর্থনীতিবিদগণ সময়কে মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সময় ছোট-বড়, ধনী-গরিব সব মানুষের জন্যই সমান। সবায় জন্যই ২৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত। যে এর সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে সে জীবনে সফল হয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শক্তি (Energy) – শক্তি দুই ধরনের হয়। শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি। যে কোনো কাজ করার জন্য দুই ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত অভ্যাস, অনুশীলন ও সূচিস্থিত পরিকল্পনা দ্বারা শক্তি ব্যয় করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সফলতা অর্জন করা যায়।

জ্ঞান (Knowledge) – গৃহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। গুণিতবিষয়ক জ্ঞান, কন্যা বিষয়ক জ্ঞান, শিশু পালনের জ্ঞান, গৃহপরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই একজন মানুষকে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গি (Out look) – ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। চিন্তা, চেষ্টা, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি। শৈশবে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে পিতা-মাতার চিন্তাধারা থেকে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই জীবনকে পরিচালিত করে।

সামর্থ্য ও দক্ষতা (Ability and Skill) – পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের সম্পদ। যে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা যত বেশি সে পরিবার তত উন্নত। তবে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা এক রকম নয়। সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সকল কাজ ভাগ করে নিলে কাজের মান ভালো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

কাজ – মানবিক সম্পদের গুরুত্ব লেখ।

২। বস্তুবাক্য সম্পদ : যে বস্তু ও সেবা চাহিদা পূরণে সহায়ক তাই বস্তুবাক্য সম্পদ। যেমন: টাকা, জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি, যেমন— রাস্তা-ঘাট, বাজার, স্কুল-কলেজ, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং গৃহজীবনকে সহজ করে।

অর্থ (Money) – অর্থ একটি বস্তুগত সম্পদ। এর বিনিময় মূল্য আছে এবং হস্তান্তরযোগ্য, পরিমাপযোগ্য। মানুষের জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিণীম। অর্থ দ্বারা আমরা দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে থাকি। এর সুষ্ঠু ব্যবহার জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করে।

জমি, বাড়ি ও অলংকার (Land, House and Ornament) – এর বিনিময় মূল্য আছে। পরিমাপ করা যায়। মালিকানা হস্তান্তর করা যায়। তবে এর ব্যবহারে সূহ্ম পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি গড়ে তুললে দুর্যোগের সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা (Social and National Facilities) – সমাজ থেকে আমরা যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করি তাই সামাজিক সম্পদ। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, স্কুল-কলেজ, বাজার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা অধিকার সূত্রে মানুষ পেয়ে থাকে। পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করে। এইগুলো একটি দেশের জনগণ অধিকার সূত্রে ভোগ করার সুযোগ পায়।

পাঠ ৪- সম্পদের সূহ্ম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা –

সম্পদ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হলো এর ব্যবহার দ্বারা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা। আমাদের চাহিদা অসীম, কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই অসীম চাহিদাকে সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করতে হলে সম্পদের সূহ্ম ব্যবহার প্রয়োজন।

- সম্পদের সূহ্ম ব্যবহার পরিবারের আয় বাড়াতে, ব্যয় হ্রাস করতে ও অর্থ সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের সময়, শক্তি, ক্ষমতা ও বুদ্ধি ইত্যাদি মানবীয় সম্পদের সূহ্মভাবে ব্যবহার করে পরিবারের আয় বাড়ানো যায় এবং ব্যয় হ্রাস করা যায়। যেমন – গৃহের অজিনায় সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, ঘরে পোশাক তৈরি ইত্যাদি।
- সম্পদের সূহ্ম ব্যবহারের ফলে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যেমন– গৃহিণী যদি পরিবারের কাজের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন তবে গৃহিণী নিজের অনেক সময় ও শক্তি বাঁচাতে পারেন। সে সময় ও শক্তি পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজে বা অবসর বিনোদনে ব্যয় করতে পারেন। এতে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জন্মে।
- সম্পদের সূহ্ম ব্যবহারে মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সুযম বণ্টন হয়। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে। যেমন– বাজেট করে চলা। সময় তালিকা করে চলা। ফলে অল্প সম্পদ দ্বারাই অধিক তৃপ্তি লাভ করা যায় এবং মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়।
- সম্পদের আয় বাড়াতে সম্পদের সূহ্ম ব্যবহার প্রয়োজন। গৃহের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বিশেষ করে রেফ্রিজারেটর, ইস্ত্রি, প্রেসারকুকার, ভেনে, আসবাবপত্র ইত্যাদির সঠিক যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ আর্থিক অপচয় হ্রাস ও মানসিক প্রশান্তি দান করে।

কাজ – সমাজ থেকে আমরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি সেগুলো সম্পর্কে লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপযোগ নির্ভর করে কোনটির উপর?

ক) জ্ঞান

খ) বুদ্ধি

গ) দৃষ্টিভঙ্গি

ঘ) দক্ষতা

২। পরিবারকে সঠিকভাবে চালানার জন্য বেশি প্রয়োজন হয় কোনটির?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ক) শারীরিক শক্তি | খ) মানসিক শক্তি |
| গ) জ্ঞান | ঘ) সময় |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে নিজে দেখাশোনা করতে পারলেন না। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল তার বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

৩। হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ক) বিকল্প সম্পদের ব্যবহার করা | খ) সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা |
| গ) ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুসরণ করা | ঘ) সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা। |

৪। হায়দার সাহেবের বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরার কারণ কী?

- সময় না দেওয়া।
- লক্ষ্য অর্জন না করা।
- ব্যবস্থাপনার ধাপ না মানা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আয়েশা বেগম একজন গৃহিণী। তিনি সীমিত সম্পদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেন। প্রয়োজনে তিনি তার পুরোনো শাড়ি দিয়ে ঘরের পর্দা, পাশোষ তৈরি করেন। আয়েশা বেগমের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার পরিবারের চাহিদা মেটান। পরিবারের সকলে তার উপর সন্তুষ্ট।

ক. শক্তি কোন দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ?

খ. কোন ধরনের সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য ব্যাখ্যা কর।

গ. আয়েশা বেগমের কাজের মাধ্যমে সম্পদের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ফলে আয়েশা বেগমের উপর সকলে সন্তুষ্ট—বিশ্লেষণ কর।

২। রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী। তার কাছ থেকে পরিবারের অন্য সদস্যরা গৃহকর্মে সাহায্য—সহযোগিতা পাচ্ছে। তিনি সদস্যদের কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে নিজে হাঁস—মুরগি পালন করে পরিবারের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেন। তার কষ্টের উপার্জিত অর্থ তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে বিভিন্ন বাহানায় নষ্ট করে। বললেও শোনে না।

ক. উপযোগ কী?

খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?

গ. রহিমা খাতুনের ছেলে কোন ধরনের সম্পদ নষ্ট করে — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গৃহপরিচালনায় রহিমা খাতুন বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শী কি না? মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পদের ব্যবস্থাপনা

পাঠ ১ – অর্থ ব্যবস্থাপনা- বাজেট, বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ও বাজেটের খাত

গৃহ ব্যবস্থাপনায় অর্থকে বস্তুবাচক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থ বস্তুবাচক সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিণীম। মানুষের যে কোনো চাহিদা পূরণ করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় অর্থের। অর্থের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ করি। অর্থকে সৃষ্টি ও সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের অসীম চাহিদাগুলো সীমিত অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। অর্থ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণ করতে অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন-চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা এবং সবশেষে মূল্যায়ন করা। পরিবার বিভিন্ন ভাবে আয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। অন্যান্য সম্পদের মতো পরিবারের অর্থসম্পদও সীমিত। যেহেতু অর্থ একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম তাই অর্থ দিয়েই আমাদের সব চাহিদা পূরণের উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে হয়। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আমরা অর্থ সংরক্ষণ করতে পারি। এ মূল্যবান সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত।

বাজেট

বাজেট হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনা। আরও সঠিকভাবে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যয় ও সংরক্ষণ করার পূর্বপরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট। বাজেটে সম্ভাব্য আয়কে কোন খাতে, কোন কোন সময়ে কী পরিমাণে ব্যয় করা হবে, তার লিখিত বিবরণ থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে মূল্যবান অর্থের অপচয় ঘটে না। অধিকমুদ্রা আমাদের সব চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা

বাজেট অর্থ ব্যয়ের একটি চমৎকার কৌশল। বাজেট সীমিত অর্থের আমাদের সকল চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে। বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- বাজেট পরিবারের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা দেয়।
- পরিবারের অপচয় রোধ করে স্বচ্ছলতা আনয়নে সাহায্য করে।
- ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে।
- গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।
- বাজেট করে অর্থ ব্যয় করলে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের সকল চাহিদা পূরণ করে তাদের সন্তুষ্টি দিতে পারে।

বাজেটের খাত

প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন কোন খাতে অর্থ ব্যয় করতে হবে সেগুলো স্থির করতে হয়। পারিবারিক জীবন বাপনের যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয়, সেগুলোই বাজেটের খাত হিসেবে পরিচিত। গুরুত্ব

অনুযায়ী খাতগুলো সাজিয়ে নিয়ে প্রতিটি খাতের মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। খাতগুলো সাজানো হয় পরিবারের প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে। জীবনধারণের প্রয়োজনে সাধারণত খাতগুলো নিম্নোক্তভাবে সাজানো থাকে—

| | |
|---|--|
| <p>খাদ্য</p> <p>ক) শূকনা বাজার, যেমন—চাল, আটা, ডাল, চিনি, চা, সেমাই, বিভিন্ন শূকনা মসলা ইত্যাদি।</p> <p>খ) কাঁচাবাজার, যেমন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি।</p> | <p>চিকিৎসা</p> <p>ক) চিকিৎসকের ফি</p> <p>খ) ওষুধ ও পথ্য</p> |
| <p>বাসস্থান</p> <p>ক) ভাড়া</p> <p>খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি।</p> <p>গ) নিম্নলিখ বাড়ির ট্যাক্স, মেরামত ও যন্ত্রবাবল ব্যয় ইত্যাদি।</p> | <p>সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি</p> <p>ক) ভাতা বা হাত খরচ</p> <p>খ) আমোদ—প্রমোদ ব্যয়।</p> |
| <p>বস্ত্র</p> <p>ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয়</p> <p>খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত</p> <p>গ) বস্ত্র ধোঁত ও ইস্ত্রি।</p> | <p>অন্যান্য খরচ</p> <p>ক) মেহমানদারি</p> <p>খ) উপহার ও চাঁদা</p> <p>গ) যাতায়াত</p> <p>ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি।</p> <p>ঙ) গৃহকর্মীর বেতন।</p> |
| <p>শিক্ষা</p> <p>ক) স্কুল—কলেজের বেতন</p> <p>খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি।</p> <p>গ) গৃহশিক্ষকের বেতন।</p> | <p>সঞ্চয়</p> <p>ক) ভবিষ্যৎ তহবিল</p> <p>খ) ব্যাংক, ইনসিউরেন্স, প্রাইজবন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি।</p> |

কাছ — ‘প্রকৃত বাজেট সময় ও শক্তির সশ্রয় করে’— তোমার যুক্তিগুলো গিণিবন্ধ কর।

পার্শ্ব ২ – বাজেট তৈরির নিয়ম

বাজেট তৈরির কতকগুলো নিয়ম আছে, যা অনুসরণ করে প্রকৃত বাজেট তৈরি করা যায়। প্রতিটি কাছ যেমন নিয়ম মক্ষিক না করলে কাজগুলো সঠিক ও সুপরভাবে করা সম্ভব হয় না, তেমনি বাজেট করার সময় নিয়ম অনুযায়ী না করলে বাজেট যথার্থ এবং কার্যকরী হবে না। বাজেট তৈরি করার নিয়মগুলো নিচে বর্ণিত হলো—

- বাজেট সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে করা হয়। তাই মাসের সম্ভাব্য মোট আয় নির্ধারণ করে নিতে হবে। আয়ের হিসাব করার সময় পরিবারের সব রকম উৎসের দিকে নজর দিতে হবে। যেহেতু অর্থ দিয়ে বাজেট করতে হয়, তাই পরিবারের মোট আর্থিক আয় নির্ণয় করতে হবে।
- যে সময়ের বাজেট করা হবে সে সময়ে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের একটি তালিকা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোকে প্রধান প্রধান খাতে শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হবে।

- তালিকাভুক্ত প্রতিটি প্রবের মূল্য নির্ধারণ করার আগে সব জিনিসের বাজারদর সঠিকভাবে জানতে হবে। এরপর সবগুলোর মূল্য একত্রে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মতামত নেওয়া ভালো। বিভিন্ন সদস্যদের কাছ থেকে প্রবামূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ভালোভাবে না জেনে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করলে বাজেট বাস্তবায়নে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- আনুমানিক আয়ের সাথে ব্যয়ের একটা সমতা রক্ষা করতে হবে। মোট আয় জ্ঞানার পর সম্ভাব্য ব্যয়ের টাকার পরিমাণের সঙ্গে হিসাব করে দেখতে হবে যেন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকে। ব্যয় যেন কখনোই আয়ের অংক থেকে বেশি না হয়। তবে পারিবারিক আয় বাড়িয়ে অথবা খরচের পরিমাণ কমিয়ে এ অবস্থার মোকাবিলা করা যায়।
- কোন খাতে কতো ব্যয় করা যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত খাদ্য খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাজেটে খাদ্য খাতে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিম্নবিত্তের বাজেটে এ খাতে আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ খরচ হতে পারে। আয় যত বাড়বে শতকরা হারে খাদ্য খাতে ব্যয়ও তত কমে যায়। সাধারণত সর্বনিম্ন বরাদ্দ দেওয়া হয়-সঞ্চয়, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে।
- পরিশেষে বাজেটটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যেন তা বাস্তবায়ন করা যায়। কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখলে বাজেটকে বাস্তবমুখী করা যায়। যেমন-প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনগুলোর দিকে খেয়াল রাখা, জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কিছু বাড়তি অর্থ সব সময় হাতে রাখা, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

একটি মাসিক বাজেটের নমুনা দেওয়া হলো-

পরিবারের মাসিক মোট আয়-৩০,০০০/- টাকা

সদস্য সংখ্যা-৪ জন।

| খাত | সম্ভাব্য খরচ (টাকা) | মোট খরচ (টাকা) | শতকরা হার % |
|--|---------------------------|----------------|-------------|
| ১। খাদ্য ক) শূকন বাজার খ) কঁচাবাজার | ৫০০০/- ৭০০০/- | ১২,০০০/- | ৪০% |
| ২। বাসস্থান ক) ভাড়া খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি। | ৭০০০/- ২০০০/- | ৯,০০০/- | ৩০% |
| ৩। বস্ত্র ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয় খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত গ) বস্ত্র যৌত ও ইন্ড্রি। | ১০০০/- ৪০০/- ২০০/- | ১,৬০০/- | ৫.৩৩% |
| ৪। শিক্ষা ক) স্কুল-কলেজের বেতন খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি। গ) গৃহশিক্ষকের বেতন। | ১০০০/- ৫০০/- ২০০০/- | ৩৫০০/- | ১১.৬৭% |

| | | | |
|---|--|----------|-------|
| ৫। চিকিৎসা ক) চিকিৎসকের ফি খ) ঔষধ ও পথ্য | ৪০০/- ২০০/- | ৬০০/- | ২% |
| ৬। সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি ক) ভাতা বা হাড খরচ খ) আমোদ-প্রমোদ ব্যয়। | ৩০০/- ৪০০/- | ৭০০/- | ২.৩৩% |
| ৭। অন্যান্য খরচ ক) মেহমানদারি খ) উপহার ও টানা গ) যাতায়াত ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ঙ) গৃহকর্মীর বেতন। | ৪০০/- ৪০০/- ২০০/- ২০০/- ১০০০/- | ২২০০/- | ৭.৩৩% |
| ৮। সঞ্চয় | ৪০০/- | ৪০০/- | ১.৩৩% |
| | | ৩০,০০০/- | ১০০% |

বিঃদ্রঃ বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের আলোকে বাজেটটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যাখ্যা করবেন।

মন্তব্য- উল্লেখিত বাজেটটিতে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান। এ রকম বাজেটকে সুস্থ বাজেট বলে। যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তাকে বলে ঘাটতি বাজেট। এ ছাড়া বাজেটে যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হয় সেটি হচ্ছে উদ্বৃত্ত বাজেট। উদ্বৃত্ত বাজেট হলো সবচেয়ে ভালো বাজেট। ঘাটতি বাজেট কখনোই কাম্য নয়। কারণ এ রকম বাজেটে ঋণের বোঝা বাড়ে।

কাজ - অভিভাবকের সহায়তায় তুমি তোমার পরিবারের মাসিক বাজেট তৈরি কর।

পার্শ্ব ৩ - সময় ও শক্তির ব্যবস্থাপনা-সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও বিবেচ্য বিষয়

পারিবারিক মানবীয় সম্পদগুলোর মধ্যে সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সময় এমনই এক সম্পদ যা কখনোই খেমে থাকে না বা কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময় সবচেয়ে সীমিত সম্পদ যা কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। সময় কখনো সঞ্চয় করা যায় না। বরং কোনো না কোনো কাজে একে ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থবহ কর্মসূচি দিয়ে যথাযথভাবে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে জীবনে সেই তত বেশি সফলতা অর্জন করতে পারে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সময়কে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কোনো দিনের শুরু থেকে আবার নতুন দিন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কী কী কাজ করা প্রয়োজন, কখন করা প্রয়োজন এবং দৈনিক নির্ধারিত কাজের জন্য কতটুকু সময় ব্যয় হবে ইত্যাদি বিবেচনা করে সময় তালিকা বা সময় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সময় যেমন তার একান্ত নিরুপেক্ষ সম্পদ সে রকম সময় তালিকাও প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন, পছন্দ, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে সময় তালিকা তৈরি হয়।

সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা

দৈনন্দিন কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে সময় তালিকা তৈরি করতে হয়। তালিকাটি এমন স্থানে রাখতে হবে, যাতে সহজেই নজরে পড়ে। তালিকা দেখে কাজ করতে থাকলে, একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। এর ফলে সময়মতো সব কাজ সম্পন্ন করার ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়। সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণিত হলো।

- **করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা জন্মে**— সময় তালিকা করে কাজ করলে করণীয় কাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা হয়। কারণ কোন কাজ একান্ত প্রয়োজন, কোন কাজ করলে ভালো হয় ও কোন কাজ প্রয়োজনে বাদ দেওয়া যায়— এসব কিছু বিবেচনা করে সময় তালিকা করা হয়।
- **সময়মতো কাজ করার অভ্যাস হয়**— কাজের সময় নির্ধারিত থাকে বলে নির্ধারিত সময়েই কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা থাকে যা ভবিষ্যতে অভ্যাসে পরিণত হয়।
- **সময়ের সাথে কাজের সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা বাড়ে**— সময় তালিকা করলে কোন কাজগুলোর জন্য সময় অপরিবর্তনীয় এবং কোন কাজগুলো প্রয়োজনে রদবদল করা যায় সে বিষয়ে ধারণা জন্মে। যেমন— ডাক্তারের কাছে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, দুপুরের ধর্মীয় কাজ এই সময়গুলো ইচ্ছে করলে বদলানো যায় না। তবে ঘুমের সময়, গল্প করার সময় ও পড়ার সময় প্রয়োজনে বদলানো যায়।
- **কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে অস্তিত্ব হয়**— সময় তালিকায় কোন কাজে কতটুকু সময় বরাদ্দ দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করতে হয়। সূতরাং সে অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়।
- **অবসর বিনোদন সম্ভব হয়**— সময় তালিকায় কাজের সাথে সাথে বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ফলে অবসর বিনোদন ভোগ করার সুযোগ থাকে, যা ক্লান্তি দূর করে নতুন উদ্দীপনায় কাজ করার প্রেরণা জোগায়।
- **কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে**— সময় তালিকা করলে সময়মতো রুটিনমাসিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে অভ্যাসের কারণে কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে। সৃজনশীল কাজ করার সময় ও সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন রকম কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সময় তালিকায় বিবেচ্য বিষয়

কার্যকর সময় তালিকা গ্রন্থনের সময় কিছু বিষয়ে বিবেচনায় আনতে হয়।

- দৈনিক করণীয় কাজগুলো ঠিক করতে হবে
- গুরুত্ব অনুসারে কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে হবে
- পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় তালিকা করা প্রয়োজন
- কোনো কাজ সুস্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন সেভাবে সময় তালিকা গ্রন্থন করতে হয়
- পারিবারিক অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা, সদস্যদের কাজের অভ্যাস বিবেচনা করে সময় তালিকা করতে হবে

- যে কাজগুলো একসাথে করলে সময় বাঁচে, সেভাবে কাজের সমন্বয় করতে হবে
- পারিবারিক কাজগুলোকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক হিসেবে ভাগ করতে হবে। যে সব কাজ সাপ্তাহিক বা মাসিক, সেগুলোকে দৈনিক সময় তালিকা থেকে পৃথক রাখতে হবে
- সময় তালিকায় কাজের সময়, বিশ্রাম, ঘুম ও অবসরের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- কঠিন কাজের পর হালকা কাজ দিতে হবে। এতে ক্লান্তি দূর হয় এবং পরবর্তী কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়
- সময় তালিকা নমনীয় হতে হবে। যাতে প্রয়োজনে কিছুটা রদবদল করা যায়

কাজ – সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করলে কী কী সুবিধা হয়, চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৪ – দৈনিক সময় তালিকা প্রস্তুত

দৈনিক সময় তালিকা অনুসরণ করে কাজ করলে করণীয় সব কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে কাজে সফলতার আনন্দে নতুন উদ্যমে আরও কাজ করার ইচ্ছা বেড়ে যায়। ছাত্রজীবনে সময় তালিকা অনুসরণ করলে সফলতা লাভ করা যায়। প্রত্যেকের উচিত মূল্যবান সময় অপচয় না করে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা।

একজন স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য সময় তালিকার দুইটি নমুনা দেওয়া হলো। তবে ঋতুভেদে এতে সময়ের কিছু তারতম্য হতে পারে। কেননা শীতের দিনে রাত বড় দিন ছোট হয়। এ ছাড়া নামাজ/ধর্মীয় প্রার্থনার সময়ও ঋতুভেদে তফাৎ হয়। তাই ঋতু অনুযায়ী এ সময়গুলো নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে সময় তালিকায় কাজের কিছুটা পরিবর্তন আনা যায়। তবে তা আবার অন্য সময়ের কাজের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। ছাত্রজীবন থেকেই সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

একজন স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য একটি দৈনিক (স্কুল খোলার দিনে)

সময় তালিকার নমুনা

| কাজের বিবরণ | সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে-পর্যন্ত | কাজের জন্য ধার্য সময় |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| সকালে ঘুম থেকে ওঠা | ৫.৩০ | - |
| প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন | ৫.৩০-৫.৪৫ | ১৫ মিনিট |
| দাঁত মাজা ও হাতমুখ ধোয়া | ৫.৪৫-৫.৫৫ | ১০ মিনিট |
| প্রাতঃকালীন নিজ ধর্মীয় কাজ করা | | |
| নিজের বিছানা গোছানো | ৫.৫৫-৬.০৫ | ১০ মিনিট |
| স্কুলের রুটিন দেখে সৈদিনকার পড়া ও বই গোছানো | ৬.০৫-৭.০৫ | ১ ঘণ্টা |
| নাশতা খাওয়া ও স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া | ৭.০৫-৭.৩০ | ২৫ মিনিট |
| বাওয়া-আসাসহ স্কুলে অবস্থান সময় | ৭.৩০-২.০০ | ৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট |
| স্কুল থেকে ফেরার পর স্কুলের কাপড় বদলানো ও স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ | ২.০০-২.২০ | ২০ মিনিট |
| গোসল ও নামাজ/প্রার্থনা | ২.২০-২.৩৫ | ১৫ মিনিট |

| কাজের বিবরণ | সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে-পর্যন্ত | কাজের জন্য ধার্য সময় |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| দুপুরের খাওয়ার | ২.৩৫-২.৫০ | ১৫ মিনিট |
| বিশ্রাম গ্রহণ | ২.৫০-৪.০০ | ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট |
| স্কুল থেকে নেওয়া বাড়ির কাজ করা | ৪.০০-৫.০০ | ১ ঘণ্টা |
| হাতমুখ ধোয়া ও বিকেলের নানাজ/প্রার্থনা | ৫.০০-৫.১৫ | ১৫ মিনিট |
| চুল ঝাঁড়ানো ও পরিপাটি হওয়া | ৫.১৫-৫.৪০ | ২৫ মিনিট |
| মা-বাবা ও ভাইবোনদের কাজে সাহায্য করা ও গল্প করা এবং সবার সাথে কিছু নিয়ে আলোচনা | ৫.৪০-৬.৪০ | ১ ঘণ্টা |
| হাতমুখ ধোয়া ও সন্ধ্যার নানাজ/প্রার্থনা | ৬.৪০-৭.০০ | ২০ মিনিট |
| হালকা নাপতা পরিবেশনে মাকে সাহায্য করা | ৭.০০-৭.৩০ | ৩০ মিনিট |
| স্কুলের পড়া তৈরি করা | ৭.৩০-৮.৪৫ | ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট |
| টেলিভিশন দেখা | ৮.৪৫-৯.৪০ | ৫৫ মিনিট |
| রাতের খাবার খাওয়া এবং পোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা | ৯.৪০-১০.০০ | ২০ মিনিট |
| টেলিভিশনে খবর শোনা | ১০.০০-১০.১৫ | ১৫ মিনিট |
| স্কুলের পড়ার বাকি অংশ শেষ করা | ১০.১৫-১১.০০ | ৪৫ মিনিট |
| হাতমুখ ধোয়া এবং নানাজ/প্রার্থনা শেষ করে সুমতে যাওয়া | ১১.০০-১১.১৫ | ১৫ মিনিট |
| সুয় | ১১.১৫-৫.৩০ | ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট |
| | | মোট ২৪ ঘণ্টা |

সময় তাগিকা

একজন স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য বন্দের দিনের সময় তাগিকার নমুনা

| কাজের বিবরণ | সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে-পর্যন্ত | কাজের জন্য ধার্য সময় |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| সকালে ঘুম থেকে উঠা | ৫.৩০ | - |
| প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন, পাতমাছা ও হাতমুখ ধোয়া | ৫.৩০-৫.৪৫ | ১৫ মি. |
| প্রাতঃকালীন নিজে নিজ ধমীর কাজ করা | ৫.৪৫-৫.৫৫ | ১০ মি. |
| নিজের বিছানা গোছানো | ৫.৫৫-৬.০৫ | ১০ মি. |
| মাকে নাপতা তৈরির কাজে সাহায্য করা ও নাপতা খাওয়া | ৬.০৫-৭.২০ | ১ ঘণ্টা ১৫ মি. |
| ভাইবোনদের লেখাপড়ার সাহায্য করা | ৭.২০-৮.০৫ | ৪৫ মি. |
| নিজের সামগ্রাহিক বোঝা কাপড় আলানা করা ও পোয়ার জন্য প্রস্তুত করা | ৮.০৫-৯.০৫ | ১ ঘণ্টা |
| মাকে ঘর গোছানো ও রান্নার কাজে সাহায্য করা | ৯.০৫-১০.০৫ | ১ ঘণ্টা |
| টেলিভিশন দেখা | ১০.০৫-১১.৩৫ | ১ ঘণ্টা ৩০ মি. |
| নথকাটা, চুল দ্যন্ত করা, কাপড় ধোয়া ও গোসল করা | ১১.৩৫-১.০৫ | ১ ঘণ্টা ৩০ মি. |
| নিজে পরিপাটি হওয়া | ১.০৫-১.৩৫ | ৩০ মি. |
| দুপুরের খাবার খাওয়া, পরিবেশন করা ও টেবিল গোছানোর কাজে মাকে সাহায্য করা ও ধমীর কাজ করা | ১.৩৫-২.৩৫ | ১ ঘণ্টা |
| মা-বাবা, ভাইবোনদের সাথে সময় কাটানো ও বিশ্রাম গ্রহণ | ২.৩৫-৩.৩৫ | ১ ঘণ্টা |
| স্কুলের সামগ্রাহিক বাড়ির কাজ তৈরি করা | ৩.৩৫-৪.৩৫ | ১ ঘণ্টা |

| | | |
|--|-------------|----------------|
| হাতমুখ দিয়ে বিকেলের ধমীয় কাজ করা | ৪.৩৫-৪.৫০ | ১৫ মি. |
| বাইরে বেড়াতে যাওয়া কেনাকাটা করা | ৪.৫০-৬.১০ | ১ ঘণ্টা ২০ মি. |
| হাতমুখ ধোয়া ও ধমীয় কাজ করা | ৬.১০-৬.৩০ | ২০ মি. |
| তাইবোনদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা | ৬.৩০-৭.৪৫ | ১ ঘণ্টা ১৫ মি. |
| নিজের স্কুলের পড়া তৈরি করা | ৭.৪৫-৯.০০ | ১ ঘণ্টা ১৫ মি. |
| টেলিভিশন দেখা | ৯.০০-৯.৫৫ | ৫৫ মি. |
| রাতে খাবার খাওয়া ও শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা | ৯.৫৫-১০.১৫ | ২০ মি. |
| স্কুলের পড়ার বাকি কাজ শেষ করা | ১০-১৫-১১.০০ | ৪৫ মি. |
| হাতমুখ দিয়ে নামাজ/প্রার্থনা শেষ করা ও ঘুমাতে যাওয়া | ১১.০০-১১.১৫ | ১৫ মি. |
| ঘুম | ১১.১৫-৫.৩০ | ৬ ঘণ্টা ১৫ মি. |
| | | মোট- ২৪ ঘণ্টা |

কাজ – গ্রীষ্মের ছুটির বশেষে এক দিনের একটি সময় তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৫ – শক্তি ব্যবস্থাপনা

অর্থ ও সময়ের মতো শক্তি পরিবারের একটি অন্যতম মৌলিক সম্পদ। মানবীয় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিতৃপ্তি নির্ভর করে। অন্যান্য সম্পদের মতো শক্তির সদ্যবহারের প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। যে কোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সে কাজে কম শক্তি ব্যবহার হয়। অথবা একই পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে বেশ অনেক কাজ করা যায়। তাহলেই আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারব। শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে তা ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তি ব্যবহার করলে, এর অপচয় রোধ করা যায়। শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য কিছু বিবয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন—

- একটি কর্মতালিকা অনুসরণ করে কাজ করতে হবে।
- কোন কাজে কেমন শক্তি ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে সহজে কাজটা করা যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- বয়স, ব্যক্তিগত গৃহস্থ, আগ্রহ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বন্টন করে দিতে হবে।
- কাজের সময় দুই হাত ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রেখে কাজ করলে শক্তির অপচয় হয় না। যেমন— দাঁড়িয়ে ঘর মুছলে, বসে ঘর মোছার চেয়ে কম শক্তি ব্যয় হয়।
- ভারী কাজের পর বিশ্রাম গ্রহণ বা হালকা কাজ করতে হয়।
- বিভিন্ন রকম শ্রমশাখর যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে শক্তির খরচ কমানো যায়। যেমন— প্রেসারকুকর, ওয়াশিং মেশিন, গুডেন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদি।

এ ছাড়া শক্তির সঠিক ব্যবহারে কিছু কৌশল অবলম্বন করে, সহজে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। গৃহ ব্যবস্থাপনা এ রকম কৌশলগুলো কাজ সহজকরণ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। কাজ সহজকরণ পদ্ধতিতে

শক্তির সূষ্ঠ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো নিম্নরূপ-

- দেহের সঠিক অবস্থান ও সঠিক গতি রক্ষা করে কাজ করা- শক্তির সূষ্ঠ ব্যবহারের জন্য কর্মক্ষেত্রে পরিসর এমন হওয়া উচিত, যাতে দেহের অবস্থান এবং দেহভঙ্গি ঠিক রেখে কাজ করা যায়। কাজের সরঞ্জামগুলো হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে শক্তির সাশ্রয় হয়।
- কাজের সঠিক স্থান ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহার- কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কাজ করলে, কম শক্তি ব্যয় করে কাজ করা যায়। যেমন-খাবার ঘরে খাওয়ার কাজ সম্পন্ন করা, খোয়ার স্থানে খোয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো সুবিধাজনক। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো কাজের স্থানে থাকলে অথবা হাঁটাটাইটিতে শক্তির অপচয় হয় না। কাজের উপযোগী সঠিক সরঞ্জামও শক্তির সাশ্রয় করে। যেমন- ঘর মোছার জন্য কাপড়ের পরিবর্তে মপ ব্যবহার আয়তমদায়ক।
- সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা- সব কাজের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, তা অনুসরণ করে কাজ করলে শক্তির সাশ্রয় হয়। যেমন-অনেক কাপড় আলাদা আলাদাভাবে না ধুয়ে সবগুলো একসাথে সাবান পানিতে ভিজিয়ে রেখে, একত্রে ধুয়ে শুকাতে দিলে কাজ সহজ হয় ও শক্তি বাঁচে।
- ব্যবহৃত সামগ্রী পরিবর্তন করা- বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর পরিবর্তন করেও শক্তির সাশ্রয় করা যায়। যেমন-খাবার টেবিলে কাপড়ের টেবিল রুল ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের টেবিল রুল ব্যবহার করলে শক্তির অপচয় কম হয়।
- উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করা- উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করেও শক্তি বাঁচানো যায়। যেমন-সালাদ বানাতে শসা, টমেটো কুঁচি করে না কেটে গ্রাইন্ড করে কাটা যায়। এতে সময় ও শক্তির সাশ্রয় হয়।

কাজ - দৈনন্দিন কাজে শক্তির সাশ্রয় করার জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার তা লিখে জানাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের চাহিদা পূরণে কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

- | | |
|---------|--------------|
| ক) সময় | খ) অর্থ |
| গ) শ্রম | ঘ) পরিকল্পনা |

২। নির্ধারিত আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখাকে কী বলা হয়?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ক) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য | খ) সঠিক পরিকল্পনা |
| গ) যথাযথ তালিকা | ঘ) সুস্থ বাজেট |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমেনা বেগম সংসারের সব কাজ একাই করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা ভারী কাজগুলো করে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন।

৩। আমেনা বেগম কীভাবে কাজ করলে হাঁপিয়ে উঠবেন না ?

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ক) ভারী কাজগুলো আগে করলে | খ) হালকা কাজগুলো আগে করলে |
| গ) ভারী কাজের পর হালকা কাজ করলে | ঘ) হালকা কাজের পর ভারী কাজ করলে |

৪। আমেনা বেগমের কাজের ক্ষেত্রে কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয়?

- i) পরিকল্পনার
- ii) সময় তালিকার
- iii) নতুন উদ্যমে কাজ করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তানজিল সাহেব একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক আয় ১০,০০০/- টাকা। স্ত্রী, স্কুল পড়ুয়া দুই সন্তান এবং অসুস্থ মাকে নিয়ে তাঁর সংসার। মাসের শুরুতে সংসার চালাবার টাকা স্ত্রীর কাছে দেন। মাস শেষ হওয়ার আগেই টাকা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কষ্ট করে বাকি দিন চালাতে হয়।

ক. বাজেট কী?

খ. বাজেটের খাত কলতে কী বোঝায়?

গ. তানজিল সাহেবের পরিবারের জন্য একটি মাসিক বাজেট প্রণয়ন করে দেখাও।

ঘ. তানজিল সাহেবের সংসারে বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায় গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নন্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এই ক্ষেত্রে দামি আসবাবের প্রয়োজন নেই। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কমদামি জিনিস দিয়েও গৃহ সজ্জা করে রুচি ও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া যায়। গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তৈরির জন্য অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নত করে মানসিক চুপ্তি লাভ করে। আর গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক উন্নতির বিকাশ ঘটে।

পাঠ ১ – আসবাব নির্বাচন

আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমিরা, বুকশেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তা ছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর ছুড়ি নেই।

শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। পরিবারের জীবনযাত্রার মান, অবস্থানের স্থান অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রাম, পারিবারিক জীবন চক্রের স্তর ইত্যাদির ভিন্নতায় আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায়।

গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলো যেহেতু স্থায়ী আবাসস্থল এবং পর্যাপ্ত আয়তনবিশিষ্ট হয়ে থাকে তাই বড় আকৃতির ভারী কাঠের আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, টেবিল, চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ, মিটসেফ, আলমিরা, আলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আম, জাম, কাঁঠাল, কড়ই ইত্যাদি গাছের কাঠ ব্যবহার করে কাঠমিস্ত্রি দিয়ে বাড়িতেই এই আসবাবগুলো নিজেদের চাহিদামতো বানিয়ে নেওয়া হয়।

শহরাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ লোকই ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে। যারা নিজেদের বাড়িতে থাকেন তারাও আয়তনের সীমাবদ্ধতার জন্য নিজেদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী হালকা ও যুগোপযোগী আসবাব ব্যবহার করে থাকেন। তা ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করতে যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য হালকা ও বৃষ্টিশীল আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, বজ্র খাট, নানা সাইজের টেবিল, লুকিং গ্রাসবুক্ট কাঠের আলমিরা, সোফাসেট, গদিওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শহরাঞ্চলে সীমিত আয়তনের নকশাদার, শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে আম, কাঁঠাল, কড়ই কাঠের পাশাপাশি সেগুন কাঠ, প্রাইউড, পারটেক্স ইত্যাদি কৃত্রিম কাঠের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। শহরাঞ্চলে রেডিমেড বা তৈরি আসবাব বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বর্তমান গ্রাম ও শহর সর্বত্রই প্রাস্টিকের তৈরি আসবাব যেমন- চেয়ার, টেবিল, খাট, র‍্যাক ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো—

- প্রয়োজনীয়তা— আসবাব ক্রয়ের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলে হুজুগের বশে ক্রয় করলে পরে অপচয়ের সামিল হয়। এ ছাড়া পুরনো আসবাব যদি রং বা বার্নিশ করে ব্যবহার করা যায় তাহলে নতুন আসবাব ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা ঠিক নয়।

- পরিবারের আয়- পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টিকটু মনে হয়।



খিচুি ঘরের আসবাবপত্র

- আসবাবের মূল্য- আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের উপর। সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আসবাবপত্রের দাম অনেক। আবার বেত ও প্রাস্টিকের বা রডের আসবাবের দাম জুটনামূলক কম।
- আরাম- আসবাব নির্বাচনে আরাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসবাবের আয়তন, উচ্চতা, গভীরতা আরামদায়ক না হলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়। যেমন: টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয় তবে কাজের সমস্যা হয়। আবার চেয়ারে বসে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে কাজ করা কষ্টকর হয়।
- উপযোগিতা- আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উপযোগী হবে। খাট, টোঁকি এগুলো আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার হাশ, মোড়ী, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। আবার আসবাব কী উপাদানের দ্বারা তৈরি তার উপরও উপযোগিতা নির্ভর করে। যেমন: কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি ফলে এর উপযোগিতা বেশি।
- স্থিতি ও গহন- আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের স্থিতি ও গহন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার আয়তন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থিতিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।
- স্বাস্থ্য- আসবাবের স্বাস্থ্য নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণ কাজের উপর। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। আবার পাকা কাঠ, মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্বাস্থ্য বাড়ায়।
- জীবনযাত্রার মান- পদমর্যাদা ও বিস্তার উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বিস্তার পরিবারের আসবাব বেশ দামি হয়। এইসব পরিবারের ছুইং হুম প্রশংস্য হয় ফলে একটু জাঁকজমকভাবে সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিস্তার পরিবারে শয়ন কক্ষের এক পাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে।
- নকশা- আসবাবের নকশা স্থিতিসম্মত হতে হবে। এই ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, আরামদায়ক ও শিল্পসম্মত নকশাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আবার নকশাটি এমন হবে যাতে পরিষ্কার করতে বেশি কষ্ট বা সময় না লাগে।
- বহুবিশ ব্যবহার- একটি আসবাব বহুবিশভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন: ডিভান বসা ও শোয়া দুই কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং টেবিল- খাওয়া, পড়াশোনা, আলোচনা করার কাজে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক ঘুণে গৃহের আয়তন কম থাকে তাই আসবাবের বহুবিশ ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

- **পরিবারের আকার**— পরিবারের আকার যদি বড় হয় তবে নমনীয় ও বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আসবাবের কথা চিন্তা করতে হবে।
- **চাকরির প্রকৃতি**— বদলির চাকরি হলে আসবাব হালকা এবং কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় এমন আসবাবই নির্বাচন করতে হবে। বেশি আসবাব বদলির সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আসবাবও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।
- **আবহাওয়া**— আমাদের দেশে গরম ও ধূলাবালি বেশি। তাই হালকা ডিজাইনের আসবাব বেশি উপযোগী এবং যত্ন নেওয়া সহজ।
- **যত্ন**— আসবাব নির্বাচনের সময় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর আসবাবের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে।
- **কক্ষের আয়তন ও আকার**— কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে হুটির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

কাজ — ছুটি তেমার পরিবারের জন্য আসবাব ক্রয় করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা হবে লেখ।

পাঠ ২- আসবাব বিন্যাস

আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে করা হয়— তা নয়। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে।

গ্রাম কিংবা শহরে সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসের কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। যথা :

প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস— আসবাব বিন্যাসের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো ঘরেই অতিরিক্ত আসবাব রাখতে নেই। বাসগৃহের জন্য আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় প্রথমে সেখতে হবে কক্ষটি কী কাজে ব্যবহার হবে। কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব রাখতে হবে। যেমন :

শয়ন কক্ষ— বাট, ওয়ারড্রোব, আলনা, আলমারি ইত্যাদি।

বসার কক্ষ— সোফাসেট, বেডের চেয়ার, টেবিল, সোফেস, বুকসেলফ ইত্যাদি।

খাবার কক্ষ— ডাইনিং টেবিল, সোফেস, ফ্রিজ ইত্যাদি।

পড়ার কক্ষ— বুকসেলফ, টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি।

- **ব্যবহারিক সুবিধা**— আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হবে।
- **চলচলার সুবিধা**— গৃহের মধ্যে চলচল, কাজ সম্পাদনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আসবাবপত্র সাজাতে হবে। ঘরের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলচলে যেন অসুবিধা না হয় ও কার্য সম্পাদনে যেন অতিরিক্ত চলাচল প্রয়োজন না হয় আসবাব বিন্যাসের সময় সে দিকে লক্ষ রাখতে হয়। যেমন: বুক সেলফটিকে পড়ার টেবিলের পাশেই রাখতে হয়। ঘরে ছোট শিশু থাকলে তাদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি খেয়াল রেখে আসবাবপত্র সাজানো শ্রেয়। শিশুরা যাতে ঘরময় স্বাধীন ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

- **কাজ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস**— আসবাব সজ্জা এমন হতে হবে যেন কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যে কক্ষে যে যে কাজ সম্পন্ন হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আসবাব স্থাপন করতে হয়।
- **আলো-বাতাস চলাচল সুবিধা**— আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে দরজা-জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। এ ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশও ব্যাহত হয়।
- **দেয়াল ঘেঁষে বিন্যাস না করা**— আসবাব বিন্যাসের সময় মনে রাখতে হবে যে টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি কখনো দেয়াল ঘেঁষে রাখতে নেই। দেয়াল হতে একটু সামান্য দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। তা না হলে ঘবা লেগে দেয়ালের রং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আসবাবপত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আসবাবপত্র বিন্যাসের মাধ্যমে কক্ষের গঠনগত ত্রুটি ঢেকে রাখা যায়।
- **গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আনা**— আসবাবপত্র বিন্যাস কখনো স্থায়ীভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। এতে গৃহসজ্জায় একঘেঁয়েমি চলে আসে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাসে বৃষ্টির রদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে।
- **শিল্পনীতির প্রয়োগ**— আসবাব বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এই শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যথা— সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়। নিম্নে আসবাব বিন্যাসে শিল্পনীতির প্রয়োগ বর্ণনা করা হলো—

ক. সমানুপাত (Proportion)— আসবাব বিন্যাসে ঘরের আকৃতির সাথে আসবাবপত্রের আকার নিবারণ করা দরকার। বড় ঘরে বড় আসবাব ও ছোট ঘরের জন্য ছোট আসবাব মানানসই। আবার যেখানে বড় ও ছোট আসবাবের সর্মিশ্রণ প্রয়োজন সেখানে বড় আসবাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ছোট দুই-তিনটি আসবাব একত্রে সাজানো যায়। আসবাবপত্রের পরস্পরের আকৃতির অনুপাত ঠিক হলে সমগ্র গৃহসজ্জার আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিত্রতা বা মিল হয়েচে বলে ধরে নেওয়া যায়।

খ. ভারসাম্য (Balance)— আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্য দিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি অন্য দিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। একটি কক্ষের দুই দিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। অন্যদিকে একপাশের জিনিসে বেশি গুরুত্ব থাকলে অর্থাৎ বেশি সাজানো থাকলে তাকে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য গৃহসজ্জায় নতুনত্ব ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

গ. সামঞ্জস্য (Harmony)— সবার সাথে সবার মিত্রতাকেই সামঞ্জস্য বলে। ঘরে কেবল দামি আসবাব, চিত্রকর্ম, সো-পিস থাকলেই হবে না। সবকিছুর সাথে একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

ঘ. ছন্দ (Rhythm)— আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখা দরকার এতে দৃষ্টি কক্ষের একটা আসবাবে আবশ্য না থেকে সহজ ও সাকলীল ভঙ্গিতে অন্য আসবাবে গিয়ে পৌঁছায়। কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৃষ্টি উঠানো যায়। দৃষ্টির এই উঠানোমাই ছন্দ। ছন্দের গতি আসবাব বিন্যাসে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একঘেঁয়েমি দূর করে এবং নতুনত্ব আনয়ন করে।

৩. **প্রাধান্য (Emphasis)**— আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।

কাঙ্ক্ষা : তুমি তোমার কক্ষে আসবাব বিন্যাসে কী কী বিষয় লক্ষ রাখবে লেখ।

পাঠ ৩ – বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস

শয়নকক্ষ (Bed Room)–

সারা দিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে।



শয়নকক্ষ

লক্ষণীয় বিষয়–

- শয়নকক্ষে খাট বা চৌকি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি, গুয়ারড্রোব ইত্যাদি আসবাব থাকে। খাট বা চৌকির অবস্থান এমনভাবে হবে যাতে চোখে আলো না পরে।
- কক্ষের দেয়ালের রং হালকা হলে ভালো হয়।
- খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য ছোট টেবিল রাখা যায়। টেবিল ল্যান্ড্রাফ থাকলে পড়ার সময় পর্বশত আলো পাওয়া যায়।
- দেয়াল সম্ভার জন্য চিত্রকর্ম থাকতে পারে। ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের উপর একপুচ্ছ ফুল ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

বসার ঘর (Drawing Room)

বসারকক্ষে পরিচিত লোকজন বা আত্মীয়স্বজন এসে বসে। সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর। এই কক্ষের বিন্যাস বাড়ির লোকদের হুচিখোচ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে।



বসার ঘরের বিন্যাস

লক্ষণীয় বিষয়–

- বসার ঘরে সোফাসেট, ডিভান, মোড়া, বুকশেলফ, সোফেস থাকে।
- কক্ষকে আকর্ষণীয় করার জন্য বড় ফুলদানিতে ফুল,

এক্সট্রিমাম, চিত্রকর্ম, খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি, কার্পেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।

- আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, চলাচলের সুবিধা, শিল্পনীতি অনুসরণ করে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

খাবার ঘর (Dining Room)

খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থল। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

লক্ষণীয় বিষয়—

- খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার সোফেস, মিটসেফ, স্ট্রিঞ্জ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল, ত্রিভুজাকৃতির বা চার কোণাকার হতে পারে। টেবিলের উপরিভাগ ফর্মিকা, কাচ বা কাঠের হয়।
- খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- টেবিলের মাঝখানে সমতল ফ্লোরদানিতে ফুল বা বুদ্ধিতে বিভিন্ন ফলের সমারোহ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।
- টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা চলাচলে অসুবিধা না হয়।
- পানির ফিটার এককোনায় একটু উঁচুতে রাখতে হবে। ঘরের বড় দেয়াল বেঁধে এমনভাবে ফ্রিজ রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পেছনে বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে।



খাবার ঘর



অতিথির ঘর

অতিথির ঘর (Guest Room)

অতিথির ঘর বসার ঘরের পাশে হলে ভালো হয়। এই কক্ষ খুব বেশি আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। খাট, ড্রেসিং টেবিল, দেয়াল আলমারি হলোই চলে।

শিডিং রুম (Living Room)

বর্তমান আধুনিক বাড়িতে খেলার ঘর ও শিডিং রুম থাকে। এই রুমে পরিবারের সদস্যরা অবসর সময় কাটায়। এই রুমে টেলিভিশন দেখা, বসা ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকে। গিটার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের জিনিসপত্র থাকে।



শিডিং রুম

পড়ার ঘর (Reading Room)

পড়ার ঘর এমন জায়গায় হবে যেখানে কোনো শব্দ বা কথাবার্তা পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটতে না পারে। পড়ার হুমে টেবিল, চেয়ার, বুকশেলফ, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে।

টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।



পড়ার ঘর

রান্নাঘর (Kitchen)

রান্নাঘর খাবার ঘরের পাশে হয়ে থাকে। এতে খাদ্য পরিবেশন করতে সুবিধা হয়। চুলার স্থান জানালার পাশে হলে সহজেই ধোয়া বের হয়ে যায়। চুলা গ্যাস, কেরোসিন বা মাটির হতে পারে। শহর এলাকায় গ্যাস, গ্রামাঞ্চলে লাকড়ি বা কেরোসিনের চুলা দেখা যায়। আবার অনেকেই হিটারেও রান্না করে। রান্নাঘরে পানির কল এক কোনায় রাখলে ভালো হয়। বিভিন্ন জিনিসের কোটা রাখার জন্য সেলফ ব্যবহার করতে হয়। দা-বীট, ছুরি ইত্যাদি ধারালো জিনিস শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।



রান্নাঘর

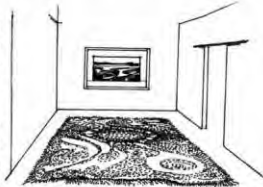
রান্নাঘরের ওয়ালে সিংহ পর্দা ক্যাবিনেট করে নিলে অনেক জিনিস রাখা যায়। তবে পোকামাকড় যাতে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পার্শ্ব ৪ - গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি

অসবাবপত্র নির্বাচন, বিন্যাসের পরই মানুষ চায় গৃহের মেঝে, দেওয়াল, পর্দা ও পুঙ্খ বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। সব কিছুর সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অপরূপ করে তোলে। সুবুজির প্রকাশ ঘটায়।

মেঝের আচ্ছাদন- আমাদের দেশে ঘরের মেঝে সিমেন্টের বা সিমেন্টের সাথে রং মিশিয়ে মেঝে তৈরি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে মাটির মেঝে থাকে। তবে আধুনিক বাড়িতে টাইলস বা মোজাইকের মেঝে দেখা যায়। শহরাঞ্চলে মেঝেতে কার্পেট ব্যবহার করা হয়। কার্পেট অসবাবের সাথে মানানসই হতে হবে। আমাদের দেশে খুলা বেশি তাই ছোট আকারের কার্পেট ব্যবহার ভালো এতে যত্ন নিতে সহজ হয়।

দেয়াল সজ্জা- প্রতিটি গৃহেরই বিভিন্ন কক্ষে ছবি বা চিত্রকর্ম দেখা যায়। গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের



মেঝের আচ্ছাদন



দেয়ালে ছবি বিন্যাস

ভূমিকা অপরিণীম। খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি গৌরবের প্রতীক। মাতৃভূমির ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে প্রশান্তি আনে।

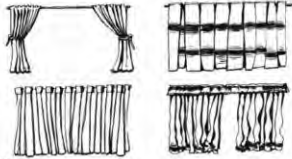
দেয়ালে ছবি টাঙানোর কিছু নিয়ম আছে। যেমন—

- ছবি টাঙানোর জন্য স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড় দেয়ালে বড় ছবি বা ছোট ছোট কয়েকটি ছবি একত্রে টাঙানো যায়।
- ছবি দৃষ্টি করার টানাতে হবে। বেশি উপরে বা নিচে ছবি টানাতে সৌন্দর্য ফুটে উঠে না এবং দৃষ্টিনন্দন হয় না।
- কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি টানাতে হবে। কক্ষের কক্ষ খ্যাতনামা ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খ্যাতনামা ব্যক্তির আঁকা ছবি রাখা যায়। খাবার ঘরে খাবারের ছবি, শিডিং রুমে পারিবারিক ছবি টাঙানো যায়। পারিবারিক ছবি শরন ঘরে রাখা স্মৃতিসম্মত।
- ছবি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পোশাক, ফুল, লতা-পাতা, ওয়ালমেট, পটশিল্প, লোকশিল্প উপকরণ দিয়েও দেয়াল সজ্জা করা যায়। তবে এক্ষেত্রে শিল্পনীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক।

পর্দা— পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করা উচিত।

পর্দার প্রয়োজনীয়তা—

- ঘরের আলো রক্ষা করে।
- ঘরে শীতলতার ভাব আনে।
- ধূলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে।
- কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়।



বিভিন্ন ধরনের পর্দা

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাই হালকা রঙের পর্দাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। এতে করে শীতলতার সৃষ্টি হয়। তবে শীতের দিনে গাঢ় রঙের পর্দা ব্যবহার করা যায়। পর্দার কাপড়টি এমন হতে হবে যাতে বস্ত্র নেওয়া সহজ হয়।

পুষ্পবিন্যাস—

পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। এই পাত্রগুলো চীনা মাটি, প্রাস্টিক, কাচ, ঝাঁপ, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে। ফুলদানি বা পাত্র গোলাকার, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি বা চারকোনা হতে পারে।



ফুল দিগ্গল

পুষ্টবিন্যাসের নিয়ম—

- ০. রং— পুষ্টবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে।
- ০. রেখা— ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রেখা বা গড়ন। লিলি, রজনীগন্ধা ফুলের লম্বা ডাটা থাকে। আবার গাঁদা, বেগি, গোলাপ এগুলো স্ফুপাকারে সাজানোর উপযোগী।
- ০. শিল্পনীতি— পুষ্টবিন্যাসে শিল্পনীতি অনুসরণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন— ফুলদানির সাথে ফুলের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ০. পুষ্টবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ গাছে যেভাবে ফুল ফুটে থাকে সেভাবে ফুলকে সাজালে ভালো হয়।
- ০. সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটিকে প্রাধান্য দিয়ে পুষ্টবিন্যাস করতে হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ফুল, পাতা সাজাতে হবে।
- ০. ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি হবে। ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্টবিন্যাস করতে হয়।
- ০. ফুলদানিতে যথেষ্ট পানি থাকতে হবে।
- ০. পিনহোল্ডার ঢেকে পুষ্টবিন্যাস করতে হবে।
- ০. পুষ্টবিন্যাসের জন্য অনেক ফুলের প্রয়োজন হয় না। দুই একটা ফুলের সাথে ডাল, লতা, পাতা দিয়েও পুষ্ট বিন্যাস করা যায়। পিন হোল্ডার ব্যবহার করে বাটি, প্লেটেও পুষ্টবিন্যাস করা যায়।
- ০. খুব ভোরে বা পড়ন্ত বেলায় গাছ থেকে ডালসহ ফুল কাটলে সেটা তাজা থাকে।
- ০. পাত্রের পানির মধ্যে তিনি মেশালে ফুল অনেক বেশি সময় ধরে তাজা থাকে।

পাঠ ৫ – গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সঞ্চার

গৃহকে আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করলেই চলবে না গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার কথাও চিন্তা করতে হবে। নিজ গৃহকে সুসজ্জিত করে রাখলে সুস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কেবল দামি, চমৎকার আসবাব দিয়ে ঘর সাজালেই চলবে না, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ময়লা, ধূলা পড়া, আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। ঘরের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিপড়া, পোকার উপদ্রব হয় এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়।

তাই গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন—

- ০. গৃহে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা :

আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অক্লান্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অশ্রুকার দূর করে। উত্তাপ রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই ঘরের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যের উপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তবে গৃহে যাতে সূর্য কিরণ এবং বায়ু প্রবেশ সহজেই করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

• গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা :

প্রতিদিন গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার করা আবশ্যিক। গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝে ময়লা হয় আসবাবের উপর ধূলাবালি জমে। এই ধূলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। তাই প্রতিদিন ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, গোসলখানার মেঝে ও আসবাবপত্র ধোয়া, মোছা করা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে সপ্তাহে এক দিন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দরজা, জানালা, রান্নাঘরের দেয়াল, বেসিন, টয়লেটের প্যান/কমোড ইত্যাদি প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করা উচিত।

• পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, বিভিন্ন আসবাবের কভার পরিষ্কার করা :

ঘরের পর্দা, চাদরে ও কভারে ধূলা জন্মায়। প্রতি সপ্তাহে বিছানার ছাদর পরিষ্কার করা উচিত। ৩/৪ মাস পর পর ঘরের পর্দা ও আসবাবের কভার পরিষ্কার করা উচিত। এতে ঘরের ধূলাবালি দূর হয়ে ঘরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

• রাতে কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা :

কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকলে চোখের ক্ষতি হয়। তাই পড়াশোনা, রান্নাঘরের কাজ, খাবার টেবিল ইত্যাদি জায়গায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক।

• গৃহের ভিতর ও চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা :

ঘরের ময়লা ফেলার জন্য ঘরের ভিতর বিন রাখা প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের চারপাশের পরিবেশ-পরিষ্কার রাখাও আবশ্যিক। ঘরের চারপাশে ময়লা, আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপ-ঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। মারাত্মক রোগ ছড়ায়। তাই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডাউবিনে ফেলতে হবে। গৃহের চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে পোকামাকড় ধ্বংস করার ঔষধ স্প্রে করতে হবে। টবে বা চারপাশে পানি জমে যেন মশার উপদ্রব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পার্শ্ব ৬ - অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। তাই গৃহের আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি গৃহসজ্জায় নানা উপকরণ ব্যবহার করা যায়। তবে গৃহসজ্জায় শুধু যে বাজার থেকে মূল্যবান জিনিসই ব্যবহার করতে হয় তা নয়। বরং নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে গৃহের অব্যবহৃত জিনিস দিয়েও নানা ধরনের শিল্প সামগ্রী বানিয়ে ব্যবহার করা যায়। শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই শিল্প সৃষ্টি করতে যেয়ে সব সময় দামি জিনিসের প্রয়োজন হয় না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় বা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েও শিল্প সৃষ্টি করে নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরা যায়।

গৃহে বিভিন্ন অব্যবহৃত জিনিসের নাম :

পানি বা কোল্ডড্রিঙ্কস এর বোতল, ক্যান, টিসুবক্স, পুরনো ক্যালেন্ডার, পুরনো কাপড়, ভিমের খোসা, কিস্কুট, চকশেট বা টিপসের শক্ত কাগজের বক্স, কাগি শেষ হয়ে যাওয়া বলপেন, ছোট হয়ে যাওয়া পেনসিল ইত্যাদি।

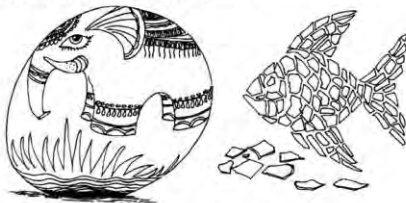
এখন আমরা অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব :

ডিমের খোসা—

প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় ডিম থাকে। ডিমের খোসা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু এই ফেলে দেওয়া খোসা দিয়েও আমরা শিল্প সৃষ্টি করতে পারি। যেমন :

ডিমটিকে একদিকে ছোট করে ছিন্ন করে ভেতরের অংশ বের করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর রোদে ভেতরটা শুকাতে হবে। তারপর ডিমের খোসার গায়ে রং দিয়ে চমৎকার বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যায়।

আবার ডিমের খোসা ছোট ছোট টুকরা করে টুকরাগুলোকে আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে শুকিয়ে গেলে তার উপর রং দিয়ে একে বিভিন্ন সূন্য স্থটিয়ে তোলা যায়।

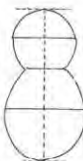


ডিমের খোসা ব্যবহার করে তৈরি করা গৃহসজ্জা সামগ্রী

পুরনো কাগজ/বোর্ড/কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে গৃহসজ্জা সামগ্রী তৈরিকরণ

নমুনা-১ : গৃহস্থের আবৃত্তিতে হোল্ডার তৈরিকরণ

উপকরণ: ক্যালেন্ডারের পাতা, শক্ত কাগজ, ফেলে দেওয়া টুকরা কাপড়, উল, পাটের দড়ি, কাগজ টার্সেল, গেইস, গোল টিপ, ফিতা, আইকা/গাম। ক্যালেন্ডারের শক্ত কাগজ ব্যবহার করে নিম্নের চিত্র অনুযায়ী কর্মী কেটে প্রথমে মূল কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে। তারপর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আঠা দিয়ে গেস লাগিয়ে, ফুল/পাটের দড়ি/টার্সেল দিয়ে বেণী তৈরি করে, গোল টিপ দিয়ে কিংবা রং দিয়ে চোখ, নাখ, ঠোঁট একে নেওয়া যায়। শক্ত কাগজের পেছনের দিকে ফিতা/দড়ি লাগিয়ে বোলানোর জন্য ছুকিং ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সম্পূর্ণ গৃহস্থ তৈরি হয়ে গেলে টেলিফোন সেটের পার্শ্বে, ক্রিপ-কীটা রাখার জন্য কিংবা ম্যাসেজ হোল্ডার হিসেবে দেয়ালে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা যায়।



কর্মীর ছবি



ম্যাসেজ হোল্ডার



ভয়াল পকেটের নমুনা

নমুনা-২ : চটের তৈরি ভয়াল পকেট

ব্যবহৃত উপকরণ- চট, বর্ডারের জন্য রঙিন কাপড়, সেলাই করার জন্য সুই-সূতা। চট দিয়ে ভয়াল পকেট বানিয়ে ছুকে খুলানোর ব্যবস্থা করে একদিকে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে রাখারও ব্যবস্থা করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবার সাথে সবার মিত্রতার নাম -

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) সমানুগাত | খ) ছন্দ |
| গ) সামঞ্জস্য | ঘ) প্রাধান্য |

২। গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ক) আলো-বাতাসের জন্য | খ) পোকামাকড়ের জন্য |
| গ) কোণ-ঝাড় পরিষ্কারের জন্য | ঘ) সুস্বাস্থ্য রাখার জন্য। |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শেফালী ঘর গোছাতে গিয়ে ঘরে পড়ে থাকা অনেক অব্যবহৃত জিনিস ফেলে দেয়। মা তাকে এই অব্যবহৃত জিনিসগুলো নানানভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

৩। শেফালী ঘরে পড়ে থাকা জিনিসপত্রে কীভাবে নতুনত্ব আনতে পারে?

- | |
|--|
| ক) অব্যবহৃত জিনিসপত্র জমিয়ে বাজারে বিক্রি করে নতুন জিনিস কেনা |
| খ) নিজে ব্যবহার না করে জিনিসের বিনিময়ে বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া |
| গ) ব্যবহার না করা জিনিসে চিত্রকর্ম করে তার রূপ গাণ্ডিয়ে ফেলা |
| ঘ) ব্যবহার না করা জিনিসগুলো দিয়ে আবার ঘর সাজিয়ে ফেলা। |

৪। কেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে শেফালীর –

- i. ঘরের পুরনো ও নতুন জিনিসের সামঞ্জস্য হবে।
- ii. নতুন শিল্প সৃষ্টি করার সুযোগ হবে
- iii. সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কালাম সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে তিনি নানা রকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্র ঘরে সাজাতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েন। এতে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

ক. আসবাবপত্র বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার কী নির্ভর করে?

খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন?

গ. আসবাব নির্বাচনে কালাম সাহেবের কোন বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটি কি যুক্তিযুক্ত ছিল? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। জরিফা বেগম সারা দিন কাজের পর গৃহে ফিরে আসেন। তিনি তার শোয়ার ঘরে ঢুকে সব সময় ক্রান্ত বোধ করেন। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থান এমনভাবে রয়েছে যে, ঘরটি কোনোভাবেই তাকে আকর্ষণ করে না। তার বোন বেড়াতে এসে বসার ঘরে ঢোকে এবং কিছু সময় পর শোবার ঘরে এসে তাকে আসবাব বিন্যাসের শিল্পনীতি সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ কী?

খ. আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. মিসেস জরিফা তার শয়নকক্ষের আসবাব কীভাবে বিন্যাস করতে পারেন— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সঠিক শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জরিফা বেগমের বাসস্থান আকর্ষণীয় হতে পারে— বিশ্লেষণ কর।

খ বিভাগ

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা—

- শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব
- বিকাশের স্তর বা ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পারব
- বিভিন্ন স্তরের বিকাশমূলক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব
- শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- শিশুর বিকাশে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক বিপর্যয়ের ধারণা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- শিশু পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কিশোর বয়সের বিভিন্ন মনোসামাজিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারব
- প্রতিবন্ধিতার কারণ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

পাঠ ১ – বর্ধন ও বিকাশের ধারণা

রামিনের বয়স দুই বছর। সে তার খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলে। কিন্তু কয়েক মাস আগে সে যেভাবে খেলত, এখন তার খেলা আরও বেশি বাস্তববোধী। সে এখন গাড়ি চালানোর সময় শব্দ করে বু বু। গাড়িটি যখন ধাক্কা খায় কিংবা গড়ে যায় তখন সে অন্য রকম শব্দ করে। অর্থাৎ গাড়ি সম্পর্কে সে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে খেলছে। পূর্বে রামিন বা-বা, দা-দা এভাবে শব্দমাত্রা আওহাজ করত, এখন সে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে, শুধু ভা-ই নয়, রামিন এখন হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, কোনো কিছু বেয়ে উঠতে পারে যা কয়েক মাস আগেও তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। রামিনের মতো বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি শিশু ধীরে ধীরে কিছু ক্ষমতা অর্জন করে, যা তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এসবই শিশুর বিকাশ। বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ কখনো থেমে থাকে না।

আমরা বিকাশ (Development) কথাটির পাশাপাশি বর্ধন (Growth) কথাটি ব্যবহার করি। বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। যখন দেখের কোনো একটি অংশের বা সমগ্র দেহের বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে আকার আকৃতির পরিবর্তন হয় সেটাই বর্ধন। শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি, ওজনের বৃদ্ধি এর সহজ উদাহরণ। বর্ধন ও বিকাশ—এর অর্থ এক নয়। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার ওজন থাকে প্রায় ৩ কেজি। ছয় মাসে তার ওজন তিনগুণ হয়, এক বছরে হয় তিনগুণ। শিশুর ওজনের বৃদ্ধি হলো পরিমাণগত পরিবর্তন বা বর্ধন। নবজাতকের ওজন বাড়ার সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছু ক্ষমতা অর্জন করে। জন্মের পর প্রথমে শিশু নিজের হাত-পা নিয়ে খেলে, পাঁচ বছরে সেই হাত দিয়ে সে ছবি আঁকে, দশ বছরে দক্ষতার সাথে হাত দিয়ে ক্রিকেট খেলার বল ছুড়তে পারে। শিশুর হাত শুধু দৈর্ঘ্যেই বাড়ে নি, তার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনই হলো বিকাশ। বর্ধনের তুলনায় বিকাশ অনেক ব্যাপক। বর্ধন হচ্ছে বিকাশের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপক্বতা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকাশজনিত পরিবর্তন হতে থাকে। বিকাশে বৃদ্ধি ও ক্ষয় – এ দুটোই ক্রিয়াশীল থাকে। জীবনের শুরুতে ক্ষয়ের চেয়ে বৃদ্ধি এবং জীবনের শেষ দিকে বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষয় বেশি হতে থাকে। বৃদ্ধি বয়সে শারীরিক, মানসিক দক্ষতার ক্ষয় হলেও চুল ও নখের বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য :

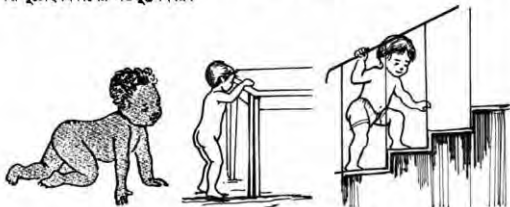
- বর্ধন বলতে দৈহিক আকার-আয়তনের পরিবর্তনকে বোঝায়। বিকাশ বলতে বোঝায়— দৈহিক আকার-আয়তনসহ পরিবর্তন এবং আচরণ, দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার পরিবর্তন।
- বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। অপর দিকে বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন। তবে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে যে কার্যকারিতা পাওয়া যায় তাই বিকাশ।



বর্ধন - উচ্চতার বৃদ্ধি

- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানবজীবনে বর্ধন সাধিত হয়। সাধারণত ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে। অপরদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ চলমান। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বিকাশের গতি জীবনের শুরুরতে ঊর্ধ্বমুখী, মধ্য বয়সে মন্দার এবং বৃদ্ধ বয়সে নিম্নমুখী। যেমন— কৈশোরে বোঝার ক্ষমতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ক্ষমতা বাড়ে।

কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি কমতে থাকে। শোনা, দেখা ও বোঝার ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং ক্ষয় দুটোই বিকাশের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।



বিকাশ – বয়স বাড়ার সাথে সাথে একা ইটিতে পারা

বিকাশের ক্ষেত্রগুলো হলো –

শারীরিক বিকাশ– বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন, ওজনের বৃদ্ধি, উচ্চতার বৃদ্ধি, বুক ঝাঁক চওড়া হওয়া ইত্যাদি।

বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ– কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, বুঝতে চেষ্টা করা, মনে রাখা, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা, সৃজনী শক্তি, সমস্যার সমাধান করতে পারা ইত্যাদি।

সংলাপনমূলক বিকাশ– জন্মের পর হাত–পা নাড়তে পারা, কসতে পারা, ইটিতে, দৌড়াতে, ধরতে পারা, লাধি মারা, ভরসাম্য রাখতে পারা ইত্যাদি।

ভাষার বিকাশ– একটি দুইটি শব্দ বলা, ছোট ছোট বাক্য কাতে পারা। প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, গুছিয়ে কথা কাতে পারা ইত্যাদি।

আবেগীয় বিকাশ– খুশি হলে হাসা, ব্যথা পেলে কাঁদা, বিকট শব্দে ভয় পাওয়া, কিছু চেয়ে না পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি শিশুর আবেগের প্রকাশ। এভাবে ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আবেগ সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন এ সব গুলোই আবেগীয় বিকাশ।



আবেগীয় বিকাশ– খুশি হলে হাসা

সামাজিক বিকাশ- জন্মের পর থেকে বয়স অনুযায়ী মা-বাবা, ভাইবোনসহ অন্যদের সাথে মিশতে পারার ক্ষমতা এবং ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজের রীতিনীতি নিয়ম অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলতে পারার ক্ষমতার বিকাশ। যেমন- অন্যকে সাহায্য করা, দয়া প্রদর্শন, সৌজন্যবোধ, সহমর্মিতা, কণ্ঠস্ব ইত্যাদি।

নৈতিক বিকাশ- সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ গড়ে উঠা, অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করা, ন্যায় কাজের জন্য তৃপ্তি পাওয়াই নৈতিক বিকাশ। মিথ্যা বলা, প্রভাষণ করা, অন্যের ক্ষতি করা ইত্যাদি নৈতিকতাবিরোধী কাজ।

শিশুর বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিশু যখন বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, তখন সে তার চারপাশের জগতের সাথে পরিচিত হয়। এতে তার বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে। আবার শিশুটি যখন নতুন কিছু শেখে তখন বড় সদস্যরা তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, আনন্দ দেয়। এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ঘটে। সুতরাং বলা যায় সকল প্রকার বিকাশের সমন্বয়ে মানব শিশুর পূর্ণবিকাশ ঘটে।



সঞ্চালনমূলক বিকাশ- বসতে পারা, হাঁটতে পারা



সামাজিক বিকাশ- কণ্ঠস্ব

কাজ - বর্ধন ও বিকাশের পার্থক্য চার্ট করে দেখাও।

পাঠ ২ - বিকাশের স্তর

আমরা সবাই জানি, জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ বা নয় মাস গর্ভে থাকার পর শিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্ত বয়স পার হয়ে একজন ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে একই রকম বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি দুই বছরের শিশু এবং একটি দশ বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যের অনেক পার্থক্য থাকে। আবার কৈশোর ও প্রাপ্ত বয়সের বিকাশ কখনোই একরকম নয়। জীবন প্রসারের সম্পূর্ণ সময়কে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলোই বিকাশের স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরগুলো হলো -

জন্মপূর্ব কাল (Prenatal Period) - জীবনের সূচনা থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়কাল। সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তনের সময়কাল হলো মাতৃগর্ভের এই সময়কাল। এই সর্গমুখিত সময়ের মধ্যে একটি এককোষী জীব একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়। জন্মগ্রহণের পর মাতৃগর্ভের বাইরের পরিবেশের সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য ভ্রূণ শিশুর মধ্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটে।



নবজাতকাল (Neonatal Period) - জন্ম মুহূর্ত থেকে দুই সপ্তাহ সময়কাল নবজাতকাল। এ সময়ে নবজাতককে নতুন পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ ও শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনে তার গ্রন্থি সক্রিয় হয়। মাতৃগর্ভের গরম পরিবেশ (১০০° ফারেনহাইট) থেকে কম তাপমাত্রার পরিবেশের সাথে তাকে সজ্ঞাতি বিধান করতে হয়। সুস্থ নবজাতক জন্মের সময় চিৎকার করে কাঁদে। তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২০ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটায়। তার যেকোনো অসুবিধা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো কাঁদা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নবজাতকের স্বাভাবিক ওজন আড়াই কেজি থেকে তিন কেজি।



অতি শৈশব ও টডলারহুড (Babyhood & Toddlerhood) - দুই সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত সময়কাল। কিছুদিন পূর্বেও যে শিশুটি বড় অসহায় ছিল সে এখন-বসতে পারে, হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে। এই বয়সের মধ্যে তার অন্যান্য সাথে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। ১ম বৎসর অতি শিশু, ২য় বৎসর হলো টডলার। শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে আত্মনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, যা তাদের স্বাধীনভাবে চলতে সহায়তা করে।



প্রারম্ভিক শৈশব (Early childhood) - ২ থেকে ৬ বছর। এ সময়ে শিশু লম্বা ও ফীণকায় হয়। হাঁটা, দৌড়ানো, আরোহণ করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে। তারা অনেক বেশি নিজের কাজগুলো করতে পারে। যেমন- নিজে খাওয়া, নিজে নিজে পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ইত্যাদি। তারা পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে খেলে। তারা সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে। এ বয়সে তারা কৌতূহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে।



মধ্য শৈশব (Middle Childhood) - ৬ থেকে ১১ বছর। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এবং নতুন নতুন দায়িত্ব পালনে দক্ষ হয়। খেলাধুলায় দক্ষ হয়, নিয়ম সমৃদ্ধ খেলায় (যেমন-গোলাচুট, বোচি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) অংশ নেয়। তারা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, ভাবার দক্ষতা অর্জন করে এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। তারা কল্পিত তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।



বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরকাল (Adolescence) - ১১ থেকে ১৮ বছর - এই সময়টি শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। বয়ঃসন্ধিক্ষেপে প্রাপ্ত বয়স্কের মতো দেহের আকার আকৃতি ও যৌন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়। যৌন ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। বিমূর্ত বিষয় চিন্তা করতে পারে অর্থাৎ যে বিষয় চোখে দেখা যায় না যেমন- সত্যতা, স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। কে কোন পেশায় যাবে সে অনুযায়ী পড়াশোনা করে।



তার মধ্যে নিজস্ব লক্ষ্য, মূল্যবোধ- তৈরি হয়। তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করে। এ বয়সে নিজ চেহারা প্রতি তাদের মনোযোগ বাড়়ে।

প্রারম্ভিক বয়ঃপ্রাপ্তিকাল (Early Adulthood) - ১৮ থেকে ২৫ বছর। পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের প্রস্তুতি- এ সময়ের অন্যতম কাজ। এ বয়সে বিয়ে ও পরিবার গঠনের আশ্রয় তৈরি হয়। অনেকে পেশা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি উত্তরণের পর বাস্তবমুখী পেশা নির্বাচনের পথ স্থির হয়। বেলাধুলায় অংশগ্রহণের চেয়ে এই বয়সে দর্পকের ভূমিকা পালনে তারা আগ্রহী হয়। তারা সরকার, রাজনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে কল্পদের সাথে চিন্তার আদান-প্রদান করে।



বয়ঃপ্রাপ্তির শেষভাগ (Late Adulthood) - ২৫ থেকে ৪০ বছর। বয়ঃপ্রাপ্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মা-বাবা হিসেবে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ। এ সময়ে বিয়ের পর দুইটি ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা দুজনের মধ্যে ঝাপ ঝাওয়া নো শিখতে হয়। সন্তান লাগন-পালন একটি নতুন কাজ, যা তাদের অবশ্যই পালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর সুপ্নের সমঝোতায় গৃহ পরিচালনায় সফলতা আসে। চাকরি, বিয়ে, সন্তান সবকিছু নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তারা বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ পায় না।



মধ্যবয়স (Middle Age) - ৪০ থেকে ৬৫ বছর। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই বয়সের ব্যাপ্তি। এটা প্রাপ্ত বয়স থেকে বার্ধক্যে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। কর্মক্ষেত্রে সফলতা বা নেতৃত্বদান এ বয়সেই হয়ে থাকে। মধ্য বয়সে প্রধান শারীরিক লক্ষণগুলো হলো-ওজন বৃদ্ধি, চুল পাকা, ঝুঁকানো ত্বক, হাত পায়ের জোড়ায় ব্যথা, দৃষ্টি শক্তির সমস্যা ইত্যাদি।



বার্ধক্য (Old Age) - ৬৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি মানব বিকাশের সর্বশেষ স্তর। বার্ধক্য ক্ষয়ের সূচনা করে। এই সময়ে শারীরিক, মানসিক অবস্থার ধারাবাহিক অবনতি দেখা যায়। তাঁদের কাজ করার শক্তি হ্রাস পায়। বৃদ্ধরা তাঁদের নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা খুব কম গঠনমূলক কাজ করতে পারে। তাদের ধর্মীয় আগ্রহ বাড়়ে। যদি বার্ধক্যে হতাশা, জীবন সম্পর্কে বিরক্তি, মৃত্যু ভয় মোকাবিলা করা যায় তবে এ সময়টিকে পরিতৃপ্তির অনুভূতি আসে।



পাঠ ৩ – বিকাশমূলক কার্যক্রম

আমরা জানি, বিকাশ ধারাবাহিকভাবে চলে। এটা কখনো থেমে থাকে না। জীবনের প্রতিটি স্তরে বিকাশ সম্পর্কে সমাজের নির্দিষ্ট প্রত্যাশা থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে সমাজের প্রত্যাশা এমন থাকে যে সে উপার্জন করবে, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়সেও পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে সে সঠিকভাবে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যক্রম গাণন করতে পারছে না ধরে নেওয়া হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে যে নির্দিষ্ট কাজ সামনে আসে তা সফলভাবে করতে পারলে জীবন হয় সুখের এবং পরবর্তী স্তরের কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। অপর দিকে এ কাজের ব্যর্থতা জীবনে আনে অশান্তি এবং পরবর্তী স্তরের সকলতায় বাধা সৃষ্টি করে। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজকেই বিকাশমূলক কার্যক্রম বলা হয়। অর্থাৎ বিকাশমূলক কার্যক্রম হলো—

- জীবনের নির্দিষ্ট স্তরে করণীয় কিছু কাজ বা সমাজ প্রত্যাশা করে।
- এ কাজের সফলতা পরবর্তী স্তরে সফল উত্তরণে সহায়তা করে, জীবনকে করে সুখী।
- এ কাজের ব্যর্থতা পরবর্তী স্তরের উত্তরণে আনে বাধা, জীবনে আনে অশান্তি।

বিকাশমূলক কাজগুলো হলো—

- বিকাশমূলক কাজের মধ্যে থাকে শারীরিক পরিপক্বতা অনুযায়ী কাজ যেমন— হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, খেলাধুলায় দক্ষতা ইত্যাদি।



বিকাশমূলক কাজ

- সমাজ সত্ত্বৃতি অনুযায়ী কাজ যেমন— লেখাপড়া করা, সুনাসরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা, নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
- নিজের আশ্রয়, মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ যেমন— শেখা নির্বাচনে নিজস্ব প্রত্যাশা, নিজের আশ্রয়, মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটি অংশ।

বিকাশমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকলে যে সুবিধাগুলো হয় তা হলো—

- বিকাশমূলক কার্যক্রম জানলে বয়স অনুযায়ী সঠিক আচরণ করা সহজ হয়।
- বাবা-মা বা শিশুর পরিচালনাকারী বয়সানুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ জানতে পারেন এবং সেভাবে শিশুর সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।
- বিকাশমূলক কার্যক্রম সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতে পূর্বস্তুতি ও প্রেরণা দেয়। এতে বিকাশের প্রতি স্তরে খাপ খাওয়ানো সহজ হয়।

অতি শৈশব ও প্রারম্ভিক শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ—

- হাঁটতে শেখা—১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে শিশু হাঁটতে পারার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- শক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে শেখা— দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশু শক্ত খাদ্য চোবা ও চিবানোর ক্ষমতা অর্জন করে।
- কথা বলতে শেখা— শিশু ৬ মাসের মধ্যে অর্থহীন শব্দ করে। ৩ বছরে দুই বা তিন শব্দের বাক্য বলে। ৫ বছরের মধ্যে বহু শব্দের ব্যবহারে পূর্ণ বাক্য বলে।
- মলমূত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ শেখা— দুই বছরের মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হয়। এর নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হয়।
- শরীরবৃত্তীয় দক্ষতা অর্জন— পাঁচ বছরের মধ্যে দেহের তাপ, বিপাক ক্রিয়ায় ভারসাম্য এবং শারীরিক গঠনে দৃঢ়তা আসে যার কারণে অল্পতেই অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।
- সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে শেখা— শৈশবের প্রথম দিকে বাবা-মা যে কাজকে পুরস্কৃত করেন বা ভালো বলেন— সেটাই ভালো কাজ এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন সেটা খারাপ কাজ, এভাবে ভালো মন্দের ধারণা তৈরি হয়।

মধ্য শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ—

- সমবয়সীদের সাথে সঠিক আচরণ করতে শেখা— এই বয়সকে দলীয় বয়স বলা হয়। সমবয়সী দলে মিশে তারা সামাজিক আদান-প্রদান, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি শেখে।
- সাধারণ খেলাধুলার প্রয়োজনীয় শারীরিক দক্ষতা শেখা— সঠিকভাবে কোনো কিছু ছোড়া, ধরতে পারা, বল সঠিকভাবে লাগি মারা ইত্যাদি কৌশলগুলো শেখার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- ছেলে ও মেয়ে অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা শেখা— ছেলে বাবার ভূমিকা এবং মেয়ে মায়ের ভূমিকা অনুকরণ থেকেই গিল্প অনুযায়ী ভূমিকা শেখে।
- পড়াশোনা ও গণনার মূল কৌশল আয়ত্ত করা— ৬ বছরের পরে স্নায়ু, আঙ্গুলের পেশি, বাহ্য লেখার উপযোগী হয়। নৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পর বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে শিশুর পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণার বিকাশ— স্কুলে যাওয়ার পর থেকে শিশু বহু বিষয় সম্পর্কে ধারণা পায়। যেমন— সময় (ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড —এর ধারণা), দূরত্ব (বাড়ি থেকে স্কুল, ঢাকা থেকে চিটাগং এর দূরত্ব), ওজন (তুলা হালকা, লোহা ভারী) ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। এই ধারণাগুলো থেকেই তাদের চিন্তা করার সূত্রপাত ঘটে।

বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ—

- উভয় লিঙ্গের সমবয়সীদের সাথে পরিণত আচরণ করতে পারা।
- বাবা-মা ও অন্যের উপর থেকে আবেগীয় নির্ভরশীলতা কমানো— শৈশবের নির্ভরশীলতা বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই কমতে থাকে। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়। অনেক সময় বাবা-মায়ের স্নেহ—ভালোবাসাকে তারা বাড়াবাড়ি মনে করে। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চাহিদা থাকে।
- বৃত্তি নির্বাচন ও পেশার জন্য প্রস্তুতি— শৈশবে পেশা সম্পর্কিত পরিকল্পনা থাকে অস্পষ্ট অবাস্তব। কৈশোরে নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতার আলোকে পেশার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় বলে তা হয় বাস্তববোধী।

- সামাজিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ গ্রহণের অগ্রহ- নিজ আচরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অগ্রহ এ সময়ের অন্যতম প্রধান বিকাশমূলক কাজ। তারা সমাজের ভালোর জন্য সংযত হয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়।
- নৈতিকতা অর্জন- এ সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের নিজস্ব ধারণা তৈরি হয়। এর আগে তাদের মধ্যে মা-বাবার শাস্তি ও পুরস্কারের উপর ভিত্তি করে জুল ও সঠিক বিষয়টি নির্ভর করত।

কাজ - মধ্য শৈশব ও কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ কোন গুলো- পৃথকভাবে ভাগিকা কর।

পাঠ ৪ ও ৫ - শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ

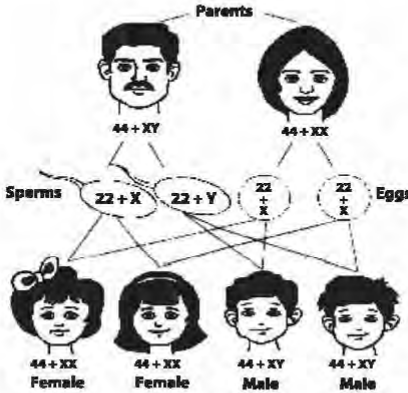
আমাদের চারপাশে যে মানুষগুলোকে আমরা দেখি তারা সবাই এক রকম নয় কেন? অন্য অবস্থায় শিশুর মধ্যে কি এমন প্রবণতা থাকে যার কারণে তার দেহের আকৃতি, গঠন, চেহারা সহ আচরণ, গুণাবলি অন্যদের থেকে আলাদা হয়? নাকি সে যে পরিবেশে জীবনযাপন করে তার প্রভাবেই তার সারা জীবনের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়! এসব প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার মাধ্যমে তারা শিশুর বিকাশে বংশগতি কীভাবে কাজ করে, বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা কী - এসব বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। আমরা এখন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব।

বংশগতি-

মেয়েটির গায়ের রং একেবারে তার দাদির মতো। ছেলেটি বাবার মতো সাহসী কিংবা মেয়েটি মায়ের মতোই গানের গলা পেয়েছে। এরকম উক্তি আমরা সব সময়ই শুনে থাকি। শিশু জন্মসূত্রে তার বাবা-মা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে সেটাই বংশগতি। বংশগতি দিয়ে শিশু তার জীবন শুরু করে। বংশগতির কারণে মানুষের সম্ভাবনামূল্যের মতো দেখতে হয়, অন্য কোনো প্রাণীর মতো হয় না। আবার উচ্চতা, দেহের গঠন, চুল, চোখ, চামড়ার রং ইত্যাদি দৈহিক গুণাবলি এবং বিভিন্ন মানসিক গুণাবলি বংশগতির কারণে একেক জনের একেক রকম হয়। বংশগতির প্রভাব জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে সারা জীবনব্যাপী চলতে থাকে।

বংশগতির সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। বাবার শূক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু নিখিত হয়ে ভ্রূণ বা জীবকোষ (Zygote) তৈরি হয়। জীবকোষের প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে- কোষ প্রাচীর, প্রোটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস হলো জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র। প্রতিটি মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে অন্যটি পিতৃকোষ থেকে। মা ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ২২টি জোড়াই ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে একই রকম থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে বহন করে। বাকি একজোড়া ক্রোমোজোম ছেলে ও মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে থাকে ভিন্ন রকমের যা নির্ধারণ করে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে। এই ২৩ তম জোড়াটিই লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম।

মায়ের ডিম্বকোষ থেকে ভ্রূণে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা সবসময়ই X টাইপ ক্রোমোজোম হয়। বাবার শূক্রাণু থেকে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা কখনো X, কখনো Y টাইপ হয়ে থাকে। যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার X ক্রোমোজোমের মিলন ঘটে তাহলে মেয়ে শিশু জন্ম নেয়। আর যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার Y ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধে তবে ছেলে শিশু জন্ম নেয়। আমরা দেখি দুটি শিশু কখনোই এক রকম হয় না। আমাদের আপন ভাইবোনের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কেন এমন হয়?



লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া

ক্রোমোজোমের এক এক জোড়া জিন মানুষের এক একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যার ফলে কেউ বেশি বৃদ্ধিমান, কেউ বা কম, কেউ বেঁটে, কেউ বা লম্বা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, মায়ের ক্রোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটি বাবার ক্রোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটির সাথে জোড়া বাঁধবে, তার কোনো বাঁধধরা নিয়ম নেই। এ কারণে একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন হচ্ছে— তাহলে অনেক সময় যমজ সন্তানের চেহারা ও আচরণ একই রকম হয় কীভাবে? একমাত্র সমকোষী যমজ শিশুর ক্ষেত্রে এ রকম হতে পারে।

যমজ শিশু দুই ধরনের হয়। সমকোষী যমজ (Identical Twin) ও ভিন্নকোষী যমজ (Fraternal Twin)। যখন একটি জীবকোষ বা জাইগোট তেলে দুটি ভূণে পরিণত হয়; তখন তারা একই গিডোর হয় এবং একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এরাই সমকোষী যমজ।

ভিন্নকোষী যমজদের ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বাণু একাধিক শূক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় মায়ের একাধিক ডিম্বাণু গর্ভিণী থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক শূক্রাণু একাধিক ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট গঠন করে। এ ধরনের যমজ দুজনেই মেলে বা দুজনেই মেয়ে বা একটি মেয়ে, একটি মেয়ে হতে পারে। দুই এর বেশি জাইগোট তৈরি হলে সন্তান সংখ্যাও দুই-এর অধিক হয়। ভিন্নকোষী যমজদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে না। এদের বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাইবোনের মতো হয়ে থাকে। শুধু পার্থক্য এটুকুই থাকে যে সাধারণ ভাইবোনেরা এক বছর বা তারও বেশি সময়ের ব্যবধানে জন্ম নেয়। ভিন্নকোষী যমজ একই দিনে জন্ম গ্রহণ করে।

শিশুর বিকাশে পরিবেশ-

শিশুর বিকাশে জন্মপূর্ব পরিবেশ ও জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃগর্ভে শিশু যে ৪০ সপ্তাহকাল অবস্থান করে সেটিই জন্মপূর্ব পরিবেশ। ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক গঠন ও বিকাশ নির্ভর করে। যেমন-গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিহীনতায় ভ্রূণশিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। আবার মায়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে হলে সন্তান ধারণে মা ও শিশু উভয়ের জীবনে ঝুঁকি থাকে।

জন্ম পরবর্তী পরিবেশ শিশু জন্মের পর হতে শুরু হয়। জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুই ধরনের হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, আলো-বাতাস, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমতল ভূমির একটি ছেলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকার একটি ছেলের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সমতলের তুলনায় পাহাড়ি অঞ্চলে জীবন ধারণ করা অনেক কষ্টসাধ্য বলে ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা হয় কর্মঠ ও পরিশ্রমী।

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, দেশীয় কৃষি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, কাক্সের পরিবেশ ইত্যাদি। শিশুর জীবনে মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের সদস্যদের স্নেহ-মমতা, সঠিক পরিচালনা পদ্ধতি তার সৃষ্টি বিকাশে সহায়তা করে। অপর দিকে মা-বাবার অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন ইত্যাদি শিশুর বিকাশে অন্তরায় হয়। ছেলে-মেয়েরা জীবনের দীর্ঘসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যয় করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি তথা শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ শিশু বিকাশে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সহপাঠী, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবার সহায়তায় শিশুর বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

শিশুর বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ কোনটির প্রভাব বেশি? এ বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। কারও মতে, শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে বংশগতির উপর নির্ভরশীল। আবার কারও মতে- শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই মুখ্য। বংশগতিক বৈরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁদের মতে শিশু যে পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি তার বিকাশকে প্রভাবিত করে। যেমন- বৃদ্ধিমান মা-বাবার সন্তানেরা বেশির ভাগ বৃদ্ধিমান হয়। জন্মের পর তিন দিন পরিবেশে লাগিত-পালিত দুই জন সমকোষী যমজের উপর গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ বছর তিন পরিবেশে লাগিত-পালিত হলেও দুই যমজ বোনের বুদ্ধি, পছন্দ, আচরণ ও স্বভাবে কোনো পার্থক্য নেই (গবেষক-গেসেল ও থমসন)।

অপরদিকে পরিবেশবাদীরা মনে করেন- ব্যক্তির বিকাশে বংশগতি যাই হোক না কেন, তাকে যদি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তবে ব্যক্তির কাক্সিত বিকাশ সম্ভব। গ্র্যাডিস এবং হেলেন নামে দুইজন সমকোষী যমজকে তিন পরিবেশে পাঠানো হয়; তখন তাদের বয়স মাত্র ১৮ মাস। হেলেন পড়াশোনা করার সুযোগ পেল। কিন্তু গ্র্যাডিস পড়ার কোনো সুযোগই পায়নি। তাদের ৩৫ বছর বয়সে তুলনা করে দেখা গেছে যে, তাদের মুখের গঠন, চেহারা, আচরণ, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তায় হেলেন গ্র্যাডিস চেয়ে অনেক উন্নত। সমকোষী যমজ বোন হিসেবে উভয়ের বৈশিষ্ট্য একইরূপ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় পরিবেশের কারণে বিকাশ পার্থক্যসূর্ণ হয়।

পরিবেশ ও বংশগতি উভয়কেই বৈরা সমর্থন করেন তাঁদের মতে- বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশ এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উন্নত জাতির বীজ থেকে উন্নত মানের ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু বীজ থেকে গাছ হওয়ার জন্য চাই উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো-বাতাস ইত্যাদি। পরিবেশের এই

উপাদানগুলোর অভাবে কখনই উন্নতমানের বীজ হতে উন্নতমানের ফলন সম্ভব হয় না। আবার উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো-বাতাস ইত্যাদি ভালো পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও উন্নত বীজের অভাবে উন্নত মানের ফলন আশা করা যায় না। অর্থাৎ শিশুর সূর্য্য বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্ব অপরিণীম।

জন্ম থেকে ক্ষীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন একটি শিশুকে উন্নত পরিবেশে প্রতিপালন করলেও তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। একই ভাবে অধিক বৃদ্ধিমত্তা নিয়ে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাকে যদি তার বৃদ্ধি বিকাশের সহায়ক পরিবেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া না হয়, তবে তার বৃদ্ধিমত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন হয় না। উপযুক্ত পরিবেশ শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। তাই বলা যায়—বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে শিশুর বিকাশ নির্ধারিত হয়।

কাজ – শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ কোনটির গুরুত্ব বেশি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে উদাহরণসহ যুক্তি উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। কোন সময়কে শিশুর নবজাতক কাল বলা হয়?

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ক) জন্ম থেকে ১ সপ্তাহ | খ) জন্ম থেকে ২ সপ্তাহ |
| গ) জন্ম থেকে ৩ সপ্তাহ | ঘ) জন্ম থেকে ৪ সপ্তাহ |
- ২। গ্রামের ছেলে মেয়েরা বেশি কর্মঠ হওয়ার কারণ—
 - i. ভৌগোলিক অবস্থা
 - ii. আবহাওয়া
 - iii. পরিচর্যা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র তাহমীনের কৌতূহলের সীমা নেই। স্কুল থেকে ফিরেই তার চারপাশের বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য সে মাকে নানা প্রশ্ন করে। ইদানীং সে দাবা খেলা শিখেছে। এতে ভীষণ আনন্দিত।

- ৩। তাহমীদ বিকাশের কোন স্তরে আছে?

| | |
|---------------|--------------------|
| ক) নবজাতক কাল | খ) মধ্য শৈশব কাল |
| গ) কৈশোর কাল | ঘ) বয়ঃপ্রাপ্তিকাল |
- ৪। ওই স্তরে তাহমীদ—
 - i. চিন্তাশক্তির বিশ্লেষণ করতে পারে।
 - ii. নিজ অবয়বের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
 - iii. ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) ii ও iii

গ) i ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ৬ষ্ঠ শ্রেণি পড়ুয়া রাফি বড় হয়ে বৈমানিক হতে চায়। সে ছেনেছে বৈমানিক হতে হলে বিজ্ঞান বিষয় ভালোভাবে জানতে হয়। তাই সে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ে। মা রাফিকে তার পছন্দমতো পড়ান। মায়ের বৈধে দেওয়া সময় অনুযায়ী তাকে খেলতে যেতে হয়। রাফি তা পছন্দ করে না।

ক. কতো বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে?

খ. বার্ষিক্যে একজন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় কেন?

গ. রাফি বিকাশের কোন স্তরে আছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভূমি কী মনে কর রাফি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। জাওয়াদ ও জারিফ দুই ভাই। তারা দেখতে অনেকটা তাদের দাদার মতো হয়েছে। তাদের বড় চাচারও দুইটি পুরসন্ধান আছে। কিছুদিন আগে জাওয়াদের ছোট চাচার প্রথম পুরসন্ধানের জন্ম হয়েছে। এ সবোদ শুনে তাদের দাদি মর্মাহত হন। জাওয়াদের দাদা এ নিয়ে তার দাদিকে মন খারাপ করতে নিবেদন করলেন এবং আরও বললেন “সন্তান জন্মের ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছু নেই।”

ক. মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে কয়টি ক্রমোজোম থাকে ?

খ. শিশুর বিকাশ বলতে কী বোঝায়?

গ. জাওয়াদ ও জারিফ একরকম দেখতে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দাদার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

শিশু বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ

পাঠ ১ – মা- বাবার সাথে শিশুর বন্ধন

একটি চারপাছের কথা ধরা যাক, বীজ থেকে যখন চারপাছটি জন্মায় তখন তা বেশ দুর্বল থাকে। এ সময়ে উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার উপর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে। একবার যদি গাছটির গোড়া মাটিতে শক্ত হয়ে যায় তবে পরবর্তীতে বিশেষ যত্ন ছাড়াই গাছটি বেড়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি মানব শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাছের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে।

সকল পরিবারই তাদের শিশুদের ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে শিশু প্রতিপালন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা স্বীভাবে তাকে সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে – এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকে না। আমরা অনেকেই জানি না যে, শিশুর সাথে খেলা ও ভাব বিনিময় শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, মা ও নবজাতকের মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েক দিনের সান্নিধ্য উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে, যা বিকশিত হতে থাকে এবং স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির কয়েকটি পদক্ষেপ হলো—

- শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া।
- শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া।
- শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো।
- শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের বুকের দুধ দেওয়া—

- বহু সত্যকৃতিতেই সোনাকে মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সোনার তুলনায় ব্রোঞ্চ মূল্যহীন। মায়ের বুকের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্চের মতোই মূল্যহীন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

- মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের ত্বকের স্পর্শে শিশু উচ্চ থাকে। এই অবস্থা আড়াই কেজির কম ওজনের শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ (মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বা কলোস্ট্রাম বলা হয়) শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- শিশু জন্মের প্রথম ৫ দিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে। তবে এই পরিমাণই নবজাতকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাক অঙ্গসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অল্প থেকে দ্রুত মিকেনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এই অবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।
- শিশুর মায়ের স্তন মুখে নেওয়া ও চোষার কালে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে মা শান্ত, অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়।
- মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে এই প্রথম যোগাযোগে অভিশয় আনন্দবোধ করেন। এভাবে মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে শিশু জীবনের প্রথম ছয় মাস শিশু মায়ের দুধ এবং ছয় মাস পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের সাথে মায়ের দুধ দেওয়া চলতে থাকে।



জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়। এই পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের বাবার ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। তিনি বিভিন্নভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করেন।

- মায়ের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করেন।
- মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেন।
- গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সহায়তা করেন।
- পরিবারে বড় শিশুটির যত্ন নিতে মাকে সাহায্য করেন।
- স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।



মায়ের সাথে বহু বছর সহযোগিতা শিশুর জন্য মায়ের পরিবেশ তৈরি করে

এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে বাবা পরোক্ষভাবে সন্তানের সাথে বন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখেন।

শিশুর কান্নায় বত ভাড়াভাড়ি সন্তব সাড়া দেওয়া–

ভাষা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে। অতি শৈশবের শিশু সাধারণত দুইটি কারণে কান্নে। ক্ষুধার কারণে এবং যে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার

কারণে। জুড়ায় শিশুকে খাবার দেওয়া এবং শারীরিক অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা যেমন— শিশুকে ভেজা বিছানায় না রাখা, মলমূত্র ঠিকমতো পরিষ্কার করা, পেট ব্যাথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজগুলো শিশুকে আরাম দেয়। শিশু যদি আরামে ঘুমাতে পারে, কান্নায় যত তাড়াতাড়ি মা-বাবার সাড়া পায়, তাকে কোলে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে মা-বাবার প্রতি শিশুর বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিপরীতে যখন শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা হয় না অথবা শিশু কোনো কারণে আরাম পায় না তখন তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। বাবা-মায়ের আদর, বদ্ব, স্নেহ ভালোবাসার অভাবে একটি শিশুর মা-বাবার প্রতি অনাস্থার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কেও শিশুটির মধ্যে অনাস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা এবং হতাশার জন্ম নেয়। সেক্ষেত্রে শিশু বেশি কান্নাকাটি করে।

শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো—

দিনের কেলার মতো রাতেও শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। রাতে মা-বাবা শিশুকে ঘুম পারিয়ে দেওয়া এই চাহিদাপূরণের মধ্যে অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরুরি। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এ ছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা-বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। বিছানায় যাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু মা-বাবাকে কাছে পেতে চায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারা দিনের কর্মকাণ্ড ঘুমানোর আগে মা-বাবাকে বলতে পছন্দ করে।



শিশুর সাথে মা-বাবার বন্ধন তৈরির অন্যতম উপায়— শিশুকে পর্দান্ত সময় ও সন্ধ্যা দেওয়া

শিশুকে পর্দান্ত সময় দেওয়া —

শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শরীর বৃত্তীয় কাজে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। এসব কাজে বাবারও সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়।

শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দিতে করণীয়—

- শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া, গল্প বলা- যা শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়
- শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া-এ থেকে শিশু বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
- পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে দেওয়া (যেমন- বাগানে পানি দেওয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি)- এতে শিশুর নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে।

এ ছাড়া জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সড়সড়, শিশুকে আদর, স্নেহ করা, বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা-বাবার কখনকে মজবুত করে। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং স্নেহ করবে তাদের কখন ততই দৃঢ় হবে এবং এ কখন তাদের পরবর্তী বয়সে মা-বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কাজ - “ শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া- শিশুর সাথে মায়ের কখন তৈরির স্রেষ্ঠ সূচনা” - বিষয়টির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ ২ ও ৩ - শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ। জন্ম গ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা-বাবা কিংবা বারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সের কোনো শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা তাদের মা-বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর ঘরে প্রবেশ করে তখন শিশু খুশি হয়ে উঠে। মা তাকে কোলে তুলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। শিশু ভয় পেলে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। জন্মগ্রহণের পরপরই শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। মায়ের কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা সবই শিশুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গবেষকরা দেখেছেন বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। শিশুর জালন-পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনো কখনো শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু জালন -পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মানসিকতা বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শুধুমাত্র সন্তানের সাথে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না, মা-বাবার নিজেদের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সম্পর্ক সুখের হতে হবে। কারণ সুখী মা-বাবার সন্তানেরাও সুখী থাকে। মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে এবং আনন্দ পায়। তাই মা-বাবার মধ্যে যখন সুসম্পর্কের অভাব থাকে তখন শিশু প্রতিগালনে তাদের মনোযোগ থাকে না। ফলে শিশুটির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি শিশুকে পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া হলেও যদি তার যথাযথ পরিচর্যা না করা হয়, তবে পর্যাপ্ত ভালোবাসা, মনোযোগ, ও উদ্দীপনা পাওয়া অপর একটি শিশুর তুলনায় তার মস্তিষ্কের বিকাশ কম হয়।

তাই-বোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মধারণাকে বিঘ্নিত করে। তাই-বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাই

বোনকে অনুসরণ করে শিশু ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে। তাই-বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায়। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মা-বাবার পাশাপাশি পরিবারে তাই-বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্য প্রয়োজন। পরিবারে তাই-বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠে।

| শিশুর তাই বা বোন হিসেবে যে সব আচরণ শিশুর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি এবং শিশুর বিকাশে সহায়তা করে | যে আচরণ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয় এবং শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - ছোট তাই বা বোনের যত্নে সহযোগিতা করা - কোনো খিনিস ভাগ্যভাগি করা - পরস্পরকে সাহায্য করা - তাদের সঙ্গ দেওয়া, খেলাধুলা করা - সবাই মিলেমিশে থাকা - তাদের সাথে দ্বৈতের সম্পর্ক তৈরি করা | <ul style="list-style-type: none"> - ছোট তাই বা বোনকে সঙ্গ বা সময় না দেওয়া - নিজের সার্থ্য বড় করে দেখা - স্বর্ধা করা - তাই-বোনের সাহচর্য এড়িয়ে চলা - বর্গড়া করা, মারামারি করা - অবহেলা করা, নিজেকে বড় মনে করা |

আমাদের দেশে ঘোঁষ পরিবার প্রথায় একটি পরিবারে আরও অনেক সদস্য থাকেন, যারা শিশুর লালন-পালনে বাবা-মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। বিশেষ করে কর্মজীবী মায়ের ক্ষেত্রে শিশুর যত্ন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা থাকে অনেক বেশি। শিশুর প্রতি আত্মীয়স্বজনের মনোভাব এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়। যখন কেউ মনে করে যে শিশুটিকে শুধুমাত্র পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। শিশুর কথা শোনা, তার সাথে খেলা করার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে শিশুর সাথে সেই সদস্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে না।



পরিবারে তাই-বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠে।

পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি শিশুর সাথে গল্প করেন, শিশুদের তাদের নিজের জীবনের অনেক ঘটনা শোনান। তারা শিশুর অসুবিধার কথা শোনেন, তা সমাধানের চেষ্টা করেন। শিশুকে আদর-ভালোবাসা দেন। এভাবে শিশুর সাথে পরিবারের সকলের ভাব বিনিময় শিশুর প্রথম বছরগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে। শৈশবে যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয় ভবিষ্যতেও শিশু তার মা-বাবা, তাই-বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে কম্পন হিসেবে ভাবতে শেখে।

কাঙ্ ১ - পরিবারের তাই-বোনের সম্পর্ক উন্নয়নের কয়েকটি উপায় লেখ।

কাঙ্ ২ - পরিবারের আর্থিক সংকটে তেমনার করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

পারিবারিক বিপর্যয়-

প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের যেখানে সে আদর, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়, সুরক্ষিত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করা হয়। পরিবার এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী একসাথে অবস্থান করেন। শিশুকে লালন পালন এবং শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে পরিবারের উপর।

শিশু পরিবারে অন্য নেয় এবং বড় হয়ে উপার্জন করতে শেখে। এই দীর্ঘ সময়ে পরিবার অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পারিবারিক এই বিপর্যয়ের মধ্যে আছে- মা কিংবা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শূন্যতা, মা-বাবার পৃথক অবস্থান কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ। এ ছাড়াও আছে বাবা-মায়ের সার্বক্ষণিক ঝগড়া, মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, পরিবারে বাবার অনুপস্থিতি বা চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসায় ক্ষতি, মায়ের উপর দৈহিক নির্ধাতন ইত্যাদি। পারিবারিক বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন, তা পরিবারের সদস্যদের কষ্টনায়ক অভিজ্ঞতার জন্য দেয়। এতে শিশু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

বাবা/মায়ের মৃত্যু- পরিবারে বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুতে পরিবারে শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সাধারণত পরিবারে বাবা উপার্জন করেন। এ কারণে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। পরিবারে বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে তাদের ভরন-পোষণ, সেখাপড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানের দিশেহারা হয়। তাদের দেখাশোনা, বস্ত্র পরিচর্যা অবহেলা হয়। বাবা কিংবা মা যে কোনো একজনের মৃত্যুতেই সন্তান স্নেহবঞ্চিত হয়।

বাবা/মায়ের গুরুতর অসুস্থতা- পরিবারে মা বা বাবার হঠাৎ কোনো গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়লে পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। মা কিংবা বাবার দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা পরিবারে সংকট সৃষ্টি করে। হঠাৎ কোনো গুরুতর অসুস্থতায় বা দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এ ছাড়া মা-বাবার সুস্থ সজ্জা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়। মা-বাবার অসুস্থতায় তারা মা-বাবাকে হরানোর ভয়ে ভীত, হতাশপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মা-বাবা ছাড়াও পরিবারের যে কোনো সদস্যের গুরুতর অসুস্থতা পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

পরিবারে ভাঙ্গান- স্বামী-স্ত্রীর মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি পারিবারিক ভাঙ্গানের অন্যতম কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা ছোট অবস্থায় পরিবারে ভাঙ্গানের আশঙ্কা বেশি থাকে। মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথকভাবে অবস্থান ছেলে-মেয়েদের মনে হতাশা, দ্বন্দ্ব, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারে ছোট শিশু থাকলে তাকে যদি বাবার কাছে থাকতে হয় তবে মায়ের স্নেহ বঞ্চিত হয়ে তার বিকাশে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারের ভাঙ্গানে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। স্কুলগামী শিশুরা বন্ধুবান্ধবদের বিরূপ মন্তব্যে মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে না হয় সেজন্য সন্তানেরা কোথাও বের হতে চায় না, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়, তারা অন্তর্মুখী হয়। তাদের মনের কষ্ট অনেক সময় শারীরিক কষ্টে রূপ নিতে পারে। যেমন- মাথাব্যথা, খাবারে অনীহা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি।

পারিবারিক বিপর্যয়ে পরিবারের সদস্যরা একত্র হয়ে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট। পরিবারের আর্থিক সমস্যা

দূর করতে এবং ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণের পরিবারের কিশোর বয়সের সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তারা যা যা করতে পারে..

- আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা।
- অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানো।
- পরিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে ব্যয় কমানো যেমন- গৃহকর্মীর কাজ নিজে করা।
- ছোট ভাই-বোনের বিভিন্ন যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া।
- তাদেরকে পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা যেন তারা নিজেকে স্নেহবঞ্চিত মনে না করে।
- ছোট ভাইবোনের সাথে অধিক সময় কাটানো।
- অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করা।
- ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য বিসৃপ পরিশ্রম করা।
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খুঁজে নেওয়া।
- ভবিষ্যতে পেশার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে আরও মনোযোগী হওয়া।

কাজ- তোমার জানা কোনো পরিবারের যে কোনো বিপর্যয়ে তারা যে ধরনের সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে- তা লেখ। ওই পরিবারটির সহায়তায় তোমার করণীয় কী তা উল্লেখ কর।

পাঠ ৪ - শিশু পরিচালনার নীতি

অনেক শিশুবিজ্ঞানী জন্মের মুহুর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন। সাদা কাগজে যেভাবে একটি ছবি আঁকা হয় ছবিটি সেভাবেই রূপ লাভ করে। ঠিক তেমনি নবজাত শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধরনের অভিজ্ঞতা পায় সেভাবেই আচরণ করতে শেখে। সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যেমন একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় ঠিক তেমনি সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে যা তার বর্তমান বিকাশকে এবং পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুরা কাদা মাটির মতো। সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুটিকে মনমতো ইচ্চে গড়ে তোলা যায়, শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। সেজন্যে শিশু পরিচালনার নীতি আমাদের জানা জরুরি।

শিশু পরিচালনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতি -

- শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন- শিশুরা অনুকরণ করে। যারা তাদের কাছাকাছি থাকে তাদের আচরণ অনুকরণ করে। শিশুদের যা যা করতে বলা হয় বা যা যা করতে নিষেধ করা হয় তার চেয়ে পরিবারের বড় সদস্যরা যা যা করেন, সেগুলোই তারা অনুকরণ করে। এ কারণে শিশুর সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার। কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। যেমন- বড়দের শ্রম্যা করা, একে অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার কোনো আচরণ করতে নিষেধ করা হলে বড়দেরও সেই আচরণ থেকে বিবর্ত থাকতে হবে। যেমন- মিথ্যা কথা না বলা, ঝগড়া না করা ইত্যাদি।

- **শিশুকে প্রশংসা করা**— প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। শিশুর মধ্যে ভালো গুণাবলী বুঝে তার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসা তার কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ বা আচরণ পাওয়া যায়। এই ভালো গুণ বা আচরণকে প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে। সে বুঝতে পারে যে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।
 - **শিশুকে শাস্তি না দেওয়া**— শিশুর কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়— শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি শারীরিক শাস্তি। মানসিক শাস্তি হলো— শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, সোহাষোণ করা, মনোবোণ না দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, ঘরে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি। শিশুকে যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীত এবং লাজুক হয়ে বেড়ে উঠে। অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, শিশুর প্রতি যে আচরণটি করা হচ্ছে, সেটা তার জন্য মানসিক শাস্তিস্বরূপ কি না। মানসিক শাস্তিতে শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সঘর্ষধনের প্রয়োজন হলে ওই নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। আচরণটি কেন খারাপ, ওই আচরণের খারাপ ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।
 - **শিশুর জন্য ইয়া বলা**— অনেকে মনে করেন শিশুকে ইয়া বলা অর্থ সে যে সকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সব কিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সব কিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে ইয়া বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যে কোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সব সময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। আমরা সব সময়ই শিশু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করি বা নির্দেশ দিয়ে থাকি। যেমন— এটা করো না, ওটা ধরো না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না ইত্যাদি। এই নির্দেশগুলোকে ইয়া বোধকভাবে প্রকাশ করতে হবে। নিচে ইতিবাচকভাবে কথা বলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—
২. 'টেবিলে কাঠের টুকরা রেখ না' না বলে বলতে হবে 'কাঠের টুকরাগুলো মাটিতে রাখ'।
 ৩. এখন খেলার সময় নয়— না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।
 ৪. মুখ ধুতে এত বেশি সময় নষ্ট করো না— না বলে বলতে হবে 'তড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাও'।
 ৫. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না— না বলে বলতে হবে 'চেষ্টা করলেই তুমি পারবে'।

ইতিবাচক নির্দেশ নেতিবাচক নির্দেশ অপেক্ষা কম প্রতিবাদ আনে, এতে কাজ ভালো হয়। বড়দের ইতিবাচক উক্তি, মন্তব্য শিশুকে নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। সে সফল হওয়ার চেষ্টা চালায়। তাকে কাজ করতে উৎসাহিত করে।

- **শিশুর সাথে ভাব বিনিময়**— শিশুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর আস্তে ও নরম এবং ভাবা সহজ হতে হয়। জোড়ে ও কর্কশ স্বরে কথা বলে শিশু ভয় পায়, তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হয়। তাহলে শিশুকে বোঝা সহজ হয়। শিশুর সাথে কথা বলতে একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়। যেমন— মনোবোণ দিয়ে তার কথা শোনা, কথার মাঝে বাধা না দেওয়া, ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রশ্ন করা ইত্যাদি।

- শিশুর জন্য আর্পণ পরিবেশ তৈরি – শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশু কম বিরক্ত করে এবং সে তার সময় আনন্দে কাটায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলাই শিশুর প্রধান কাজ। গৃহে শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার স্থান ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হয়। এ জন্য দামি খেলনা বা ব্যয়বহুল উপকরণের প্রয়োজন হয় না। স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা মূল্যে শিশুর খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন– গাছের পাতা, প্রাস্টিক সামগ্রী, কাগজের বাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া শিশুদের গান, ছড়া, গল্প শোনানো, তাদের সাথে খেলা করা, তাদের নতুন কিছু দেখতে, শুনতে, ধরতে, করতে, স্বাদ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য বয়সোপযোগী সঠিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা– শিশু পরিচালনায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনোস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজি three A's for happiness দিয়ে এবং বাংলায় সুখের ত্রি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স- স্বীকৃতি A- Acceptance

স- স্নেহ A- Affection

স- সাফল্য A- Achievement



স্বীকৃতি– সকল শিশুর চেহারা বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। কেউ যদি দেখতে সুন্দর হয় তবে সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এখানে স্বীকৃতি অর্থ শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঞ্জু বা স্বাভাবিক, বৃশ্চি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

স্নেহ– প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

সাফল্য– প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এ জন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো ভুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কি পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

কাজ ১– শিশুর বিকাশে প্রশংসা ও শাস্তির ফলাফলের তালিকা কর।

কাজ ২– কয়েকটি নেতিবাচক বাক্য ইতিবাচক ভাবে রূপান্তর কর। ক্লাসে তা গড়ে শোনো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অসিটোসিন কী?

- | | |
|-------------|-------------------|
| ক) কোষ | খ) হরমোন |
| গ) এন্টিবডি | ঘ) শিশুর প্রথম মল |

২। বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা—

- স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।
- ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চায়না যৌথ পরিবারের গৃহিণী। সৎসারের বেশির ভাগ কাজ তাকেই সামলাতে হয়। কাজ শেষে তিনি প্রায়ই দেখতে পান তার সাত মাস বয়সী শিশুটি ভেজা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

৩। চায়নার সন্তানের মাঝে কিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হবে?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক) সন্তুষ্টি | খ) অনাস্থা |
| গ) সহানুভূতি | ঘ) নিরাপত্তাবোধ |

৪। পরবর্তী সময়ে চায়নার শিশুটি—

- প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হবে।
- হতাশাগ্রস্তভাবে বেড়ে উঠবে।
- আচরণগত সমস্যায় ভুগবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

- ১। আট বছর বয়সী সেজান বরাবরই নিজ আগ্রহে পড়তে বসে। পড়া শেষে সে নিজ থেকেই বইগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। বাবা বিষয়টি খেয়াল করে তাকে ধন্যবাদ দেয়। এক দিন সেজানের মা সেজানকে শুকলে তার কশুর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন। বাসায় ফিরে তিনি সেজানের কাছ থেকে ঝগড়ার কারণ জেনে নেন এবং তাকে কশুর সাথে মিলেমিশে চলতে বলেন। তিনি কখনো সেজানের সামনে কারও সাথে উচু স্বরে কথা বলেন না এবং কারও প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন না।
 - ক. কোন বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না?
 - খ. শিশুকে ইয়া বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ।
 - গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে কীরূপ প্রভাব ফেলবে?
 - ঘ. ভূমি কি মনে কর সেজানের বাবা-মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করছেন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ২। আজাদ রহমান ও সাম্মা হোসেনের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এমনি এক মুহুর্তে তাদের চার বছরের সন্তান ইনান মায়ের সাথে খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ের কাছে সাড়া না পেয়ে সে বাবার কাছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বারনা ধরে। বাবা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলেন। বিষয়টি খেয়াল করে দাদি তাকে গল্প শোনানোর কথা বলে কাছে ডেকে নেন। এমন ঘটনা ইনানের পরিবারে প্রায়ই ঘটে। এতে করে দাদির সাথে ইনানের বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে।
 - ক. শিশুর সুস্থতা ও বৈচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী ?
 - খ. শালদুগ্ধের উপকারিতা বুঝিয়ে লেখ।
 - গ. ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে ওই পরিবারে দাদির ভূমিকা কীরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়- বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা-প্রতিকার ও প্রতিরোধ

পাঠ ১ ও ২ - কৈশোরকালীন মনোসামাজিক সমস্যা

১৮ বছরের মধ্যে রিদিতা। মা-বাবার একমাত্র সন্তান রিদিতা, মেধাবী ও প্রতিভাবান। মা-বাবা থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন সবাই রিদিতার বড় ধরনের সফলতা আশা করে। বাবা-মা তাদের একমাত্র সন্তানের সফল চাহিদা পূরণ করেন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার সব রকম সুযোগ তৈরি করে দেন তারা। রিদিতা এখন প্রচণ্ড দৃষ্টিভাগ্যবান। মা-বাবার স্বপ্ন সে কি পূরণ করতে পারবে? সে কি পারবে সামনের ভর্তি পরীক্ষায় সফলতা আনতে? কিছুই ভালো লাগে না তার। অল্পতেই রেগে যায়, অল্পতেই তার ক্রান্তি আসে। ইদানীং রাতের কোলাহল ঘুম আসতে চায় না। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় সে হটকট করে।

উপরের ঘটনাটিতে একটি কিশোরী মেয়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্য দিয়ে কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার চিত্র হুটে উঠেছে। তোমরা কি জানো মনোসামাজিক সমস্যা অর্থ কী? এতো আমরা বিস্তারিতভাবে এ সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেই।

বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরীরা বড় ধরনের সমস্যা ছাড়াই বয়ঃসমীক্ষণ বয়স পার করে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা সাংঘাতিকভাবে তাদের জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং তাদের সমস্যা তাদের পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, সহপাঠী সবার জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো পরোক্ষভাবে সমাজের সবাকেই প্রভাবিত করে। এ সমস্যাগুলোই মনোসামাজিক সমস্যা। কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা, মাদকাসক্তি, বিষপ্ৰতা, স্কুল পলায়ন ইত্যাদি। যে ছাত্রটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই স্কুল ত্যাগ করে, সে শুধু নিজের ভবিষ্যতই নষ্ট করে না, সমাজের জন্যও সে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা দুই ধরনের হয়। একটি অন্তর্মুখী ও অপরটি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের মানসিক ও আবেগীয় জটিলতায় ভোগে। যেমন- হতাশা, উদ্বেগ ইত্যাদি। বাইরে থেকে এ ধরনের সমস্যার প্রকাশ কম থাকে অর্থাৎ তাদের দেখে হয়তো মনে হবে, সে খুবই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে খুব যন্ত্রণায় ভুগছে। আবেগীয় এসব সমস্যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। যেমন- হতাশা ও বিষপ্ৰতা থেকে খাদ্যে অনীহা, ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

বহির্মুখী সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সমস্যা তার আচরণে প্রকাশ পায়। বহির্মুখী মনোসামাজিক সমস্যা হলো মাদকাসক্তি, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি। সাধারণত পারিবারিক কক্ষনের অভাব বা পরিবারের অতিরিক্ত প্রশ্রয় বহির্মুখী সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। অপর দিকে মা-বাবার অতিরিক্তশীলতা অন্তর্মুখী সমস্যার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। সব কিছুতেই শাসন, সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখা অতিরিক্তশীল মা-বাবার বৈশিষ্ট্য। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয় ধরনের সমস্যা একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত। যেমন- অনেকে অপরাধপ্রবণ বিষপ্ৰতায় ভোগে, আবার হতাশাগ্রস্ত কিশোর মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

কিশোর অপরাধ-

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো কৈশোরকাল। এ সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়। কৈশোরের একটি ছেলে বা মেয়েকে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। কৈশোরকাল প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। সাধারণত ১১ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোরকাল।

কৈশোরকালে কোনো ছেলে বা মেয়ে আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে তাদেরকে কিশোর অপরাধী বলা হয়। বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুসারে কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে ছেলেদের ৮ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে এবং মেয়েদের ১৮ বছরের মধ্যে কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলে তাকে সংশোধনের জন্য বিশেষ বিচারের সামনে হাজির হতে হয়। কিশোর অপরাধ হলো অপ্রাপ্ত বয়সে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আইনকানুনবিরোধী আচরণ। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে ধরনের কাজ শাস্তিবোধ্য অপরাধ, সে ধরনের কাজ ১৬ বছরের নিচে ছেলেরা এবং ১৮ বছরের নিচে মেয়েরা সংঘটিত করলেই তা কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে না। তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য সংশোধনী কেন্দ্রে রাখা হয়।

বয়স্কদের অপরাধ যেমন পরিকল্পিত থাকে কিশোরদের অপরাধ থাকে অপরিকল্পিত এবং সংখ্যায় অনেক বেশি। কিশোর অপরাধের যে ধরনগুলো আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় তা হলো- স্কুল পলায়ন, মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ, চুরি, ছিনতাই, খুন, ডাকাতি, মারামারি, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

মনোস্তাধিকেরা কিছুটা ভিন্নভাবে কিশোর অপরাধীদের চিহ্নিত করেন। যেকোনো অগ্রহণযোগ্য কাজ তা আইনের সৃষ্টিতে শাস্তিবোধ্য অপরাধ না হলেও তা কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে। যেমন- করণ জিনিস অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখা, অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করা, অন্যের জীবনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এটা হতে পারে কোনো গাড়িকে টিল মেয়ে পাগিয়ে যাওয়া, বিনা কারণে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, শুষু মজা করার জন্য কোনো ক্ষতি করা, যে কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ করাই কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে।

অনেকে বয়ঃসম্মি বয়সের আগে থেকেই অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত ৭/৮ বছর বয়স থেকে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ করে। যেমন- মারামারি করা, অন্যের জিনিস নষ্ট করা, চুরি করা ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধের কারণ হিসেবে মানসিক সমস্যা বা বিপর্যয়কে দায়ী করা হয়। কিশোর অপরাধের উপর দীর্ঘদিনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ছোট বেল থেকে অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকে তারা বড় হয়েও অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তাদের সম্পর্কে গবেষকদের আরও অতিমত -

- এই ধরনের অপরাধীদের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি থাকে।
- এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরিবার দরিদ্র কিংবা ভগ্ন পরিবার অর্থাৎ পরিবারে মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক বসবাস করা।
- এইসব কিশোর অপরাধীর মা-বাবার শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি সঠিক না। তাদের পরিবারের শৃঙ্খলার অভাব, সন্তানদের প্রতি মা-বাবার অবহেলা থাকে।
- এ ধরনের অপরাধের জন্য বর্ণগত কারণকেও দায়ী করা হয়; অর্থাৎ পরিবারের বাবা বা অন্য সদস্যরাও অপরাধী হয়ে থাকে।
- অনেক সময় অপরাধীরা অপরাধ জগৎ থেকে বের হতে পারে না। সে জন্য তা স্বাধীন হয়ে যায়।

যারা কৈশোরের আগে থেকে অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত তাদের ছোটবেলা থেকেই কিছু লক্ষণ থাকে। তারা সমবয়সীদের তুলনায় স্কুলে অমনোযোগী থাকে, তাদের বুদ্ধি থাকে বা আইন ক্রিম কম থাকে, তাদের সমবয়সীদের সাথে কষ্টতৃপ্ত সম্পর্ক থাকে না। এসব লক্ষণ একটা ছোট শিশুর কিশোর অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ায়।

আরেক ধরনের অপরাধী আছে যারা কিশোর বয়সে এসে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। তারা সমবয়সী দলের চাপে পড়ে অপরাধী হয়। এদের অপরাধ প্রবণতা ভতটা গুরুতর হয় না। এরা সমবয়সীদের সাথে দলে অপরাধমূলক কাজ করে।

এদের সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল হলো—

- এ ধরনের কিশোরদের মা-বাবা তাদের সন্তানদের পরিচালনায় ভতটা সচেতন না।
- দলে থেকে তারা অপরাধ ঘটায়।
- মধ্য কৈশোরে অপরাধের মাত্রা খুব বেশি থাকে।
- কৈশোরের শেষের দিকে তা চলে যায়।

প্রতিকার-প্রতিরোধ

যে কোনো সমস্যা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। কোনো সমস্যা তৈরি হওয়ার পর সমাধান করা হলো প্রতিকার করা। সমস্যাটির যেন উদ্ভব না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে অপরাধী কিশোর কিশোরীদের জন্য সশোধন প্রতিকার আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী—সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। অপরাধীকে ঠই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সশোধন প্রতিকারে রাখা হয়। সশোধন প্রতিকারে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। যেমন— সেলাই এর কাজ, কাঠের কাজ, অটো মোবাইলের কাজ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে কিশোর ছেলে মেয়েরা তাদের সশোধনকালীন শেষ হওয়ার পর বাড়িতে ফিরে যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তারা জীবিকার জন্য উপার্জন করতে পারে। প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন তাদের নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক অপরাধী ছেলেমেয়েদের পর্ববেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।



প্রতিরোধ কার্যক্রম

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কিছু করণীয় হলো—

- প্রতিটি পরিবারে সন্তানের সাথে মা-বাবার কন্ঠন সূচ্য করতে হবে।
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব থাকবে না।
- পরিবারের ভাষা রোধ করতে হবে। মা-বাবার মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীর যেকোনো সমস্যা সমাধান সহজ হবে।

কিশোর অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিশোরদের নিজেদেরও কিছু করণীয় থাকে। প্রথমত কৈশোরের হেলে-মেয়েকে তার বন্ধুদের অপরাধমূলক কাজকে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, যোমেশার জন্য ভালো বন্ধুদল নির্বাচন করতে হবে। আইন বা নিয়ম ভঙ্গকারীকে খারাপ বন্ধু হিসেবে চিনে নিতে হবে।

মা-বাবাকে সম্ভানের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে যেন সন্তান অপরাধমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। সব সময় অপরাধ ছগতের খারাপ দিকগুলো সন্তানের সামনে তুলে ধরতে হবে। তারা যেন এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক বন্ধুর মতো হলে কৈশোরের সমস্যা অনেক কম হয়।

কাজ ১ – আমাদের দেশে বিদ্যমান কিশোর অপরাধের কারণগুলো কী কী?

কাজ ২ – কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয়গুলোর তালিকা কর।

পাঠ ৩ – হতাশা ও বিষণ্ণতা

ভোর রাতে ঘুম ভেঙেছে স্বপ্নার। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে আছে সে। মাসের ডাকে বিরক্ত হয়, মেজাজ করে। নবম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্না কিছুদিন হলো স্কুলে যাচ্ছে না। সারা দিন নিজের ঘরে থাকে। বান্ধবীদের খোঁজ নেয় না। কোনো কাজেই আনন্দ পায় না। টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখার অগ্রহও তার মধ্যে নেই। স্বপ্নার বৈশিষ্ট্য এমন ছিল না। হাসি-খুশি স্বপ্না বদলে গেছে।



কৈশোরে বিষণ্ণতা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনায় মন খারাপ হওয়া, কাজ করতে ইচ্ছা না করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এ রকম মনের অবস্থা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে এবং তা শরীরকেও প্রভাবিত করে তখন সেটা দৃষ্টিভঙ্গার বিষয় হয়ে পঁড়ায়। বিষণ্ণতা এক ধরনের মানসিক অবস্থা যেখানে মনের অসুখী ও একঘেয়েমির অনুভূতি থাকে। এর ফলে দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের অগ্রহ থাকে না এবং সে হতাশায় ডুর্গতে থাকে। খাবারে অনীহা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি ধরনের শারীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নার মধ্যে হতাশা ও বিষণ্ণতার লক্ষণ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

বিষন্নতা গুরুতর হলে নিচের লক্ষণ দেখা দেয়—

- দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা বা বিরক্তির অনুভূতি থাকা
- আনন্দময় কোনো কাজে অগ্রহ কমতে থাকা
- ওজন কমে যাওয়া বা দৈনিক শক্তি কমে যাওয়া
- ঘুমের ব্যাধাত হওয়া। ঘুমের স্বাভিভ বজায় থাকে না, বারবার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম আসতে চায় না বা ভোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় ইত্যাদি
- ক্ষুধা কমে যাওয়া, খাবারের অগ্রহ কমে যাওয়া
- মনোযোগের অভাব, উদ্বেগ বেশি হলে কোনো কিছু মনে রাখতে না পারা
- নিজের ক্ষতির চিন্তা করা, আত্মহত্যার পরিকল্পনা করা।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে বিষন্নতা বেশি দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে কৈশোরের বিষন্নতার সাথে শিশুকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ সম্পর্ক আছে। যে ধরনের পরিবারে শৈশবে সন্তান ও মা-বাবার দৃঢ় বন্ধন থাকে না, শিশু প্রতিপালনে স্নেহ আদরের বন্ধন থাকে এবং পরিবারের মা বা বাবা যে কোনো একজনের মৃত্যুতে নেতিবাচক মানসিক কাঠামো তৈরি হয়। এসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা ও বিষন্নতার সম্ভাবনা থাকে।

হতাশা ও বিষন্নতার কারণ

- শিশু প্রতিপালনে অতিরিক্ত কঠোরতা বিষন্নতা আনতে পারে। সেখানে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠে না। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আত্মবিশ্বাস হারায়। এ ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কারণে হতাশান্বিত থাকে, নিজেকে অপরাধী মনে করে।
- পরিবারের বাবা-মায়ের দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের মধ্যে বিষন্নতা সৃষ্টি করে। পরিবারের আর্থিক সংকট কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিষন্নতা আনে।
- সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য, কষ্টকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, বন্ধুত্বের ভাঙন বিষন্নতার সৃষ্টি করে।
- পড়াশোনায় ব্যর্থতা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপে বিষন্নতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার-প্রতিরোধ

বিষন্নতায় ছেলেমেয়েরা নিজেকে খুব একা, অসহায় মনে করে। সামান্য কারণেই তারা কেঁদে ফেলে, তারা কর্ম দক্ষতা হারায় এবং গুরুতর হলে আত্মহননের চিন্তা করে থাকে। এভাবে বিষন্নতায় অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে। বিষন্নতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয়গুলো হলো—

- যে কোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখা।
- যে কোনো ঘটনার ভালো দিকগুলো ঠুঁছে পেতে শেখা।
- জটিল অবস্থা মেনে নেওয়ার ধৈর্য তৈরি করা। নিজের চিন্তা, অনুভূতি বাবা-মা বা নির্ভরযোগ্য কারও কাছে প্রকাশ করা।
- শব্দ, বিনোদন, সৃজনধর্মী কাজ, খেলাধুলায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

- অন্য কারণে বিষমুত্তার তাকে সজ্ঞা দেওয়া, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। সে যেন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

কাজ - বিষমুত্তার কারণগুলো উল্লেখ কর। এর পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ কর।

পাঠ ৪ – মানসিক চাপ

দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে আমাদের মন খারাপ হয়। কখনো অন্য কারণে কাঁট কথা বা অস্বীকার আচরণে আমরা মনে কষ্ট পাই। নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা পূরণ না হলে আমাদের মন খারাপ হয়। আবার কোনো দুঃসংবাদ বা ঘটনা আমাদের মন কষ্টের কারণ হয়। এই মনের কষ্ট থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ। মানসিক চাপ এক ধরনের বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর আকৌশীয় অবস্থা, যা আমাদের মনে দৃষ্ণ ও হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে আমরা অস্থির ও উত্তেজিত হই এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হয় আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি। এই চাপ কখনো তীব্র আবার কখনো মৃদু হয়। মানসিক চাপ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে।

ইতিবাচক চাপ— দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে হয়। একে যদি আয়ত্তাধীন রাখা যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে এই চাপ অনেক সময় আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ও সাফল্য বয়ে আনে। যেমন— পরীক্ষার সময় যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় তা পড়াশোনা মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

আবার চাকরির ইন্টারভিউ বা নতুন চাকরি, বিভিন্ন কাজ বা অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব আমাদের ইতিবাচক মানসিকচাপ সৃষ্টি করে।

নেতিবাচক চাপ— মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু চাপ মাঝে মধ্যে দেখা দেয় যা স্নায়ুবিদ্যুৎ চাপ সৃষ্টি করে। ফলে মনের মধ্যে বিদ্রূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটাই নেতিবাচক চাপ। এই চাপ আমরা সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিকল্পকতার সৃষ্টি করে বা ছন্দপতন ঘটায়।

নেতিবাচক চাপ আমাদের নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন—

- বুক ধড়ফড় করা, হাত-পা কাঁপা, জিহ্বা শুকিয়ে আসা, অস্থিরতা, উদ্বেজনা বোধ, আচরণে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- দীর্ঘমেয়াদি ও তীব্র মানসিক চাপ শরীরে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন— হৃদরোগ, উদররক্তচাপ, মূত্রশক্তি হ্রাস, স্নায়ুশক্তি হ্রাস, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ আমাদের জীবনে প্রায়ই দেখা যায়। নিচের দুইটি ঘটনা থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

শিক্ষক লক্ষ করলেন ক্লাসে মিনা মন খারাপ করে বসে আছে। শিক্ষক কারণ জ্ঞানতে চাইলে মিনা কেঁদে ফেলে। সে জানায় তার ছোট ভাই খুব অসুস্থ। ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু ঋর ভালো হচ্ছে না। সে তার ভাইকে নিয়ে খুব দুঃখিতার আছে। ফলে সে পড়াশোনা মনোযোগ দিতে পারছে না।



মিনা দুঃখিতার

রক্ষিক নবম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা নেই। সংসারে অনেক অভাব। তাই সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বইয়ের দোকানে কাজ করে। তার পড়াশুনা করার খুব ইচ্ছা। আর্থিক অনটনের কারণে সে সব সময় চিন্তা করে কীভাবে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সবার এক রকম নয়। আবার চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়াও সবার এক রকম নয়। চাপের সময় অনেকে হীরস্থির ও শান্ত থাকে। অনেকে চাপের মুখে অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মানসিক চাপের সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বয়স, মানসিক গঠন, সম্মানবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মানসিক চাপের কারণ— নানা কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

- কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুঃসংবাদ।
- পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, দরিদ্রতা, বঞ্চনা, দুঃখ—বেদনা, নিরাপত্তার অভাব।
- সামাজিক উৎপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য, নৈতিকতার অবক্ষয়।
- নিজেদের ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ না হওয়া।
- রূমাণ্ডত কাজের চাপ।
- পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা।
- সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকা।

মানসিক চাপ থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় —

- যে কোনো বেদনাদায়ক অবস্থায় বা দুর্ঘটনায় মনোবল বজায় রাখতে হবে।
- ধৈর্যধারণ করতে হবে। ধৈর্যধারণ করা মানুষের একটি বড় গুণ।
- পারিবারিক কোনো বিষয় মানসিক চাপের কারণ হলে, পরিবারের সবাই আলোচনা করে তা মোকাবিলা করতে হবে।
- কারও কোনো বৈষম্যমূলক আচরণে মন খারাপ হলে, তার সাথে কথা বলে নিজের মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।
- পরীক্ষায় খারাপ করে যাতে হতাশায় পড়তে না হয় সেজন্য সময়মতো ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে।
- সময় পরিকল্পনা বা কর্মপরিকল্পনা করে চললে সময়মতো সব কাজ শেষ হবে ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না এবং জীবনে সাক্ষ্য আসবে।
- মনে যদি কোনো আতঙ্ক, ভয় বা দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্তির জন্য বিষয়টি নিয়ে বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য কনসেলিং-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে হবে।
- কনসেলিং নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। ভালো ও সং মানুষের সাথে কনসেলিং করতে হবে।
- কেউ বিরক্ত করলে বা অযৌক্তিক কোনো কথা বলে দূরত্বের সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে।

কাজ : কোনো বিষয় বা ঘটনা যদি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তখন তুমি কী করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কৈশোরকালের বয়সসীমা কতো বছর?

ক) ৮-১৬

খ) ৮-১৮

গ) ১১-১৮

ঘ) ১৬-১৮

২। কৈশোরে মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কোনটি?

ক) খাদ্যে অনীহা

খ) বিষণ্ণতা

গ) ঘূমের ব্যাঘাত

ঘ) ক্রান্তি

নিচের অনুচ্ছেদটি গড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৯ম শ্রেণির ছাত্র সুমন। সে ক্লাসে অমনোযোগী। মা-বাবার চাইতে কণ্ডুদের কথার গুরুত্ব দেয় বেশি। মা কিছু বললে সে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে।

৩। সুমনের মধ্যে কোন সমস্যার লক্ষণ দেখা দিয়েছে?

ক) বিষণ্ণতা

খ) ক্রোধ

গ) কিশোর অপরাধ

ঘ) উদ্বেগ

৪। কীভাবে এই পর্যায় থেকে সুমনকে বের করে আনা সম্ভব—

i. ভালো কণ্ডু নির্বাচনের মাধ্যমে

ii. অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ না দেয়া

iii. সন্তানের সাথে মা-বাবার দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইমনের বয়স ১৩ বছর। সে মাঝে মাঝে স্কুলে পালায়, ক্লাসে সে অমনোযোগী। তার স্কুলের শিক্ষক তাদের বাড়িতে এসে জানতে পারেন ইমনের বাবা-মা আলাদা বসবাস করেন।

ক. প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী?

খ. কৈশোরে খাবারে অনাসক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইমনের বয়সী ছেলেমেয়েদের অপরাধী হয়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমনকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনা সম্ভব কি না—উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায় প্রতিবন্ধী শিশু



পাঠ ১- প্রতিবন্ধী শিশু

একটি সুস্থ শিশু সবারই কাম্য। পরিবারে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যাদের শারীরিক গঠন স্বাভাবিক নয়, হাত বা পা নেই কানে শোনে না, ফলে কথা বলতে পারে না। অনেকে চোখে দেখে না বা কম দেখে। বুদ্ধিমত্তা কম, ফলে সামাজিক আচরণ ও তাব বিনিময় ঠিকমতো করতে পারে না। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এই প্রতিবন্ধী শিশুরা আমাদের সমাজেরই একজন, তাই এদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। প্রতিবন্ধী শিশু সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাদের প্রতি সবার ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে, প্রতিবন্ধী শিশুটিও নিজেই সবার থেকে অলাদা বা অসহায় মনে করবে না।

প্রতিবন্ধিতার কারণ : বিভিন্ন কারণে একটি শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। যেমন - ১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ
২। শিশু জন্মের সময়ের কারণ, ৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণ

১। জন্মের পূর্বকালীন কারণ -

শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও গর্ভের পরিবেশ শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে। গর্ভাবস্থায় নানা কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে এবং প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে। কারণগুলো হচ্ছে -

- মায়ের রোগসমূহ - গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মা যদি জার্মানহাম, চিকেনপক্স, মাম্পস, যক্ষা, ম্যাসেরিয়া, রুবেলা ভাইরাস, এইডস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর উপর তার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়।

এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গতা ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এ ছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

- **মায়ের অসুস্থি** – গর্ভবর্তী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তাক্ততায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান তবে ভ্রূণের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়, ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হয়।
- **ঔষধ গ্রহণ** – গর্ভাবস্থায় মা যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খান, তা শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক ঔষধ ভ্রূণের অঙ্গ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে ফলে শিশু যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।
- **মায়ের বয়স** – গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিণত বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তাই অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি বয়সে অন্তঃস্রাব গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যবলি হ্রাস পায়। তাই ৩৫ বৎসরের পর যে সব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সে সব শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
- **ঘন ঘন ষ্টিচুনি** – গর্ভাবস্থায় মা যদি ঘন ঘন ষ্টিচুনি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে ও তার মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ** – আপন মামাতো, খালাতো, ফুফাতো, চাচাতো ভাইবোন যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের মধ্যে বিবাহ হলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- **তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ** – গর্ভাবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাস এন্ড্রো-রো বা অন্য কোনো ভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে তবে গর্ভস্থ ভ্রূণের নার্ততন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- **মা-বাবার রক্তের Rh উপাদান** – মা যদি Rh পজেটিভ আর বাবা যদি Rh নেগেটিভ হয় তা হলে গর্ভস্থ সন্তানের Rh পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে যদি মিল না থাকে তবে তাকে Rh অসংগত বা Rh incompatibility বলা হয়। এতে মৃত সন্তান হয়। আর যদি শিশু বেঁচে যায় তাহলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মস্তিষ্কের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২। শিশু জন্মের সময়ের কারণসমূহ –

- শিশুর জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হলে, শিশুর গলায় নাড়ি পৌঁছানোর কারণে বা শিশু জন্মের পর পরই শ্বাস নিতে অক্ষম হলে অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু বৃদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
- জন্মের সময় মস্তিষ্কে কোনো আঘাত, যেমন– পড়ে যাওয়া বা মাথায় চাপ লাগা ইত্যাদি প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে।

৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণসমূহ –

- নবজাতক যদি জন্মিমে আক্রান্ত হয় এবং রক্তে যদি বিগিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে মস্তিষ্কে কোষের ক্ষতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- শৈশবে শিশু যদি হঠাৎ করে পরে যায়, মস্তিষ্কে আঘাত পায় বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

- পরিবেশের বিবর্তন পদার্থ, যেমন- পোকামাকড় খসলে করার রাসায়নিক পদার্থ, ফ্লোরাইড, আর্সেনিক মিশ্রিত পানি ইত্যাদি শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে বিবর্তিয়ার সৃষ্টি হয় এবং শিশু প্রতিকর্ষী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- শিশুর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিগত উপাদানের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিগত উপাদানের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং শিশু মানসিক ও শারীরিক প্রতিকর্ষী হতে পারে।

কাজ - শিশুর জন্য পরবর্তী প্রতিবন্ধিতা রোধে তুমি কীভাবে তোমার এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে?

পাঠ ২ - প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ

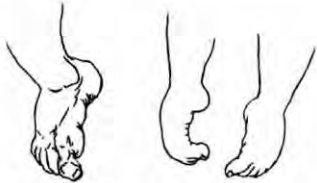
শিশু জন্ম গ্রহণের পর পরই যদি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায় তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা হ্রাস করা সম্ভব অথবা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতা থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। অতি শৈশবে শিশুর ইটা, চলা, বসা, কথাবলা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি যথাযথভাবে না হয় তবে বুঝতে হবে শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা আছে। আবার শিশু যদি কোনো কিছু বঝতে অসুবিধা বোধ করে, অমনোযোগী হয়, অব্যাহিত আচরণ করে তাহলেও প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা থাকতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

শারীরিক প্রতিকর্ষী শনাক্তকরণ - বেশির ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশু জন্মের পর চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে প্রকাশ পায়।

টোট কাটা - উপরের টোট ঠিকমতো গঠিত হয় না। টোটে ফাঁকা থাকে। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণে ও কথা কাতে সমস্যা হয়।



টোট কাটা



মুগুর পা

কাটা তালু - মুখের ভিতরের উপরের দিকে তালুর হাড় ও মাংসপেশি ঠিকমতো গঠিত হয় না। ফলে খাদ্য গ্রহণ, কথা বলা এবং শোনার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়।

মুগুর পা - একটি বা উভয় পা ভিতর বা পিছন দিকে ঝাঁকানো থাকে।

সাইনো বিকিটা – মেয়দেডের হাড় (কশেরুকা) ঠিকমতো জোড়া লাগে না। ফলে মেয়দেড পিঠের দিকে ধলির মতো ফুলে উঠে। ইটিচশায় সমস্যা হয়।

সেরেব্রাল প্যাসি – জন্মের সময় শিশুকে অনেক সময় শিথিল বা নেতানো মনে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য শিশুদের মতো হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারে না। মাথা ভোলা, বসা ইত্যাদি খুব ধীরগতিতে হয়। দুধ চুষতে ও গিলতে অসুবিধা হয়।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা গঠন বিকৃতি – শিশু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা অসম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ হাত-পা, আঙুল থাকে না বা গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। দেহের গঠনও বিকৃত হতে পারে।

বুন্দি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ – বুন্দি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে এক ধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি স্থায়ী প্রকৃতির। বুন্দি প্রতিবন্ধীতার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে যত্ন ও শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক শিশুর আচরণের উন্নয়ন ঘটানো যায়। তাই আমাদের উচিত দ্রুত শনাক্ত করে শিশুর যথাযথ যত্ন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা। তবে সব বুন্দি প্রতিবন্ধীরা একই ধরনের নয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে সাধারণভাবে বুন্দি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায়।

- ইটি, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো বয়সের জুলায় কম হয়।
- কোনো বিষয়ে শিশু মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- কোনো নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না। একই নির্দেশনা বার বার দিতে হয়।
- শিশু কোনো শিক্ষণ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি মল-মূত্র ত্যাগের শিখনও সহজে গ্রহণ করতে পারে না।
- সূক্ষ্ম কোনো কাজ করতে পারে না। অব্যক্তি আচরণ করে।
- সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না। সামাজিক আচরণ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারে না।
- ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যায় বা ঝিচুনি হয়।

বুন্দি প্রতিবন্ধিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিছু রোগ যা দেখে বুন্দি প্রতিবন্ধিতা সহজে শনাক্ত করা যায়।

মাইক্রোসেফালি – মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়। এরা গুরুতর বুন্দি প্রতিবন্ধী হয়।

হাইড্রোসেফালি – মাথার ভেতরে তরল পদার্থ জমে থাকে ফলে মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক বড় হয়। এরাও গুরুতর বুন্দি প্রতিবন্ধী হয়।

ডাউন সিন্ড্রোম – গোলাকার মুখোমণ্ডল, তীর্যক চোখ, চোখের পাতা গুরু হয়। জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে। হাত, পা ও ঘাড় ঝাটো হয়। উপড় হতে, বসতে ও ইটিতে দেরি হয় এবং এরা বুন্দি প্রতিবন্ধী হয়।

ক্রিটিনিজম – শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিলম্ব হয়। শিশুর দেহে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কম হয়। ফলে বে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় – শিশু খুব ধীরে বেড়ে উঠে। কপাল ছোট, মুখমণ্ডল ও হাত-পা ফোলা এবং বুন্দি প্রতিবন্ধীতা থাকে।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা দ্রুত শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

পাঠ ৩ – দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ ও প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ

চোখের ও কানের নিম্নলিখিত অবস্থা দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। প্রতিবন্ধিতার ধরন শনাক্ত এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ–

- চোখের পাতা লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া। চোখের পাতার কিনারে শুষ্ক আস্তরণ।
- চোখ থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া।
- ঘন ঘন চোখ রগরানো ও চোখ কঁচকানো।
- বর্ণ চিনতে ভুল করা। বর্ণ উল্টা দেখা।
- লেখার সময় অসম ফাঁক দেওয়া, সারি সোজা রাখতে না পারা।
- কাছের বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া বা দেখতে না পারা।

শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ –

- কানের গঠনগত ত্রুটি বা বিকৃতি থাকলে কান–পাকা রোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকা।
- উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা বা কথা কম বলা।
- কিছু শোনার সময় কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করা। রেডিও, টিভি শোনার সময় শব্দ বাড়িয়ে দেওয়া বা কাছে গিয়ে শোনা।
- কোনো প্রশ্ন বার বার করা বা এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেওয়া।
- কথা না বলে হাত ও মুখ ভঙ্গিমার মাধ্যমে বা ইশারায় ভাব বিনিময় করা।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ : প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবন্ধী শিশু যাতে জনগ্রহণ না করে এবং শিশু জনগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয় সে দিকে সবার সচেতনতা প্রয়োজন। এই জন্য যা করণীয় তা হচ্ছে–

গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ – গর্ভকালীন মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে দেওয়া। পুষ্টিকর খাবার না খেলে অনেক ক্ষেত্রে শিশু পূর্ণাঙ্গ সময়ের আগেই জনগ্রহণ করে অথবা শিশু কম ওজনের হয়। এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভকালীন প্রথম মাসগুলোর পুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ শিশুর মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে।

ঔষধ গ্রহণে সতর্কতা – গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ গ্রহণ ও মাদক, সিগারেট থেকে বিরত থাকলে কিছু কিছু জন্মদ্রুটি এবং মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রতিবেশিক টিকা গ্রহণ – বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে হলে গর্ভধারণের আগে বুকে ভাইরাস বা জার্মান হাম প্রতিরোধক টিকা নিতে হবে। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাকে হনুটংকর থেকে রক্ষার জন্য টিটি টিকা দিতে হবে।

শিশু কিশোরকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া – ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। শিশুদের গাঢ় সবুজ রঙের এর শাকসবজি, হলুদ ফলমূল খাওয়ালে এই প্রতিবন্ধিতা

প্রতিরোধ করা যায়। জনপ্রহণের পর পরই মায়ের প্রথম দুধ শিশুকে দিতে হবে এই দুধে কলস্ট্রাম নামক হলদে বর্ণের পদার্থ থাকে, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা – ঘন বসতি ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গুরুতর প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

বেশি বয়সে সন্তান ধারণ রোধ – বেশি বয়সে সন্তান গ্রহণ বৃদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অন্যতম কারণ। তাই বেশি বয়সে সন্তান ধারণ নিবৃত্তিসাহিত করতে হবে।

রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ রোধ – ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে পারলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

আঘাত ও রোগ সঙ্ক্রমণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ – শিশুর কানে, চোখে, মাথায় আঘাত বা রোগ সঙ্ক্রমণ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন – পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ। সমাজের অনেক লোকই বিভিন্ন ঝুঁকি ও পূর্বসতর্কতামূলক ধারণা না নিয়েই সরাসরি জমিতে রাসায়নিক স্রব্য ব্যবহার করে পোকামাকড় নিধন করে। এর ফলে অনেকে দূষ্টিগ্রীন, পক্ষাঘাতগ্রস্ততার শিকার হয়।

বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ – আমাদের দেশের অনেক শিশু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করে। যদিও দেশের শ্রম আইনে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অলুহানি, দূষ্টিহানি হয়। মেরুদণ্ডে আঘাত বা মাথায়ে আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক শিশু খান মাড়াইয়ের সময় খান ছিটে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও দূষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা রোধে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিতে তেমনদের করণীয় সম্পর্কে ক্লাশে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কতো বছর বয়সের পর কোনো মহিলার প্রথম সন্তান জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশংকা থাকে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক) ২৫ বছর | খ) ৩০ বছর |
| গ) ৩৫ বছর | ঘ) ৪০ বছর |

২। মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

- | | |
|------------------|----------------|
| ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা | খ) সাধারণ জ্বর |
| গ) টিকেন পজ | ঘ) বাত জ্বর |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমির সন্তান জন্মগ্রহণের পর পরই স্বাস নিতে পারে না। নার্স ছোট্টাছুটি করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর শিশুটির স্বাসকার্য চাপু করা হয়। এতে শিশুটি গ্রাণে রক্ষা পায়। পরবর্তী সময়ে শিশুটি বৃদ্ধি প্রতিবক্ষী হয়।

৩। শিশুটির জন্মের পরপরই নার্সদের কী করণীয় ছিল?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক) পানি খাওয়ানো | খ) মধু খাওয়ানো |
| গ) অক্সিজেন দেওয়া | ঘ) তেল মালিশ করা |

৪। রিমির শিশুটি প্রতিবক্ষী হওয়ার কারণ কোনটি?

- শিশুটির জন্মকালে সময় বেশি লেগেছিল।
- শিশুটির মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি হয়েছিল।
- শিশুটির মাথায় চাপ লেগেছিল।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১। কণার বয়স ৩৫। গর্ভকালীন সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সে খাওয়াদাওয়াও ঠিকভাবে করে না। নিজের প্রতি খেয়াল করে না। শিশুটির জন্মের পর পরই শিশুটির রক্তের বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। শিশুটি বড় হতে থাকলে সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, ইটাচলা ইত্যাদির বিকাশ কম হয়।

ক. মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকাকে কী বলে?

খ. কোন শিশুকে প্রতিবক্ষী শিশু বলা হয়?

গ. কণার শিশুকে কোন ধরনের শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কণার অসচেতনতা কণার শিশুর এই পরিণতি নিয়ে আসে—এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

গ - বিভাগ খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা



এ বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা-

- খাদ্যের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব
- খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের গঠন, উৎস, কার্যকারিতা ও শ্রেণিবিভাগ করতে পারব
- খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত রোগ চিহ্নিত করতে পারব
- খাদ্য পরিণাক- প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব
- কিশোর বয়সে খাদ্যের চাহিদা ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব
- নিয়মতান্ত্রিক জীবনব্যাপন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ রোগ সম্পর্কে ছেনে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনব্যাপন প্রণালি বর্ণনা করতে পারব
- খাদ্য গ্রন্থিতে রেসিপি প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব
- খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন গম্ভীর ব্যাখ্যা করতে পারব।

দশম অধ্যায়

খাদ্যের কাজ ও উপাদান

পাঠ-১ : খাদ্যের কাজ

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলোই আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। আমাদের শরীরে খাদ্য গ্রহণের ফলে যে কাজগুলো সম্পন্ন হয় তা হলো—

- ১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন
- ২। ক্ষয় পূরণ
- ৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান
- ৪। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ
- ৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি

১। দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন – খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রোটিন দেহ গঠনের কাজ করে থাকে। শিশুর শরীর গঠনের জন্য পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। একটি মাত্র কোষ থেকে মায়ের পেটে শিশুর বৃদ্ধি ঘটে। কোষ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২টি কোষে বিভক্ত হয়। এভাবে আবার নতুন কোষ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ কোষ এবং আরও পরে কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গা মানব শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধির জন্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ খাদ্যের কাজ হলো শরীর গঠনের মাধ্যমে বৃদ্ধি সাধন করা। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান এই কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

২। ক্ষয় পূরণ – প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, আর এই ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ পূর্ণগঠন করার কাজও খাদ্যের। প্রতিনিয়তই পুরনো কোষের মৃত্যু ঘটে যার ফলে কিছু পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বের হয়ে যায় আর কিছু পুষ্টি উপাদান শরীরে থেকে যায় যা নতুন কোষ গঠনে অংশ নেয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের সাথে ওইগুলো যুক্ত হয়ে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আমরা যদি একছোড়া জুতা ক্রমাগত পরতে থাকি, তাহলে তার তলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একসময় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু জুতা ছাড়া যদি ইটা হয় তাহলে কিছু পায়ের তলা ছুতার মতো ক্ষয় হয়ে যায় না। কারণ প্রতিনিয়তই মৃত কোষ বা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলোর জায়গায় নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে এবং ক্ষয়পূরণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে অসুস্থ থাকার পর বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে নতুন কোষ তৈরির মাধ্যমে ক্ষতস্থানের ক্ষয়পূরণ ঘটে। তাই প্রত্যেক মানুষের শরীরেই খাদ্য হতে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো এই ক্ষয়পূরণের কাজ করে শরীরকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।



খাদ্যের কাজ

৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান – একটি গাড়ির ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল বা গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই জ্বালানি পুড়ে শক্তি তৈরি হয়, যার ফলে গাড়ি চলতে পারে। আমাদের শরীরকেও এই গাড়ির ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করতে পারি। আমাদের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরের কোষে জ্বালানির মতো পুড়ে শক্তি তৈরি করে। ফলে আমরা সচল আছি এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারি। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরে যে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, তার ফলে আমরা কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করি। বেঁচে থাকার জন্য রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, খাদ্যের পরিপাক এবং মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ, যা সম্পাদন করতে শক্তির প্রয়োজন। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখনও শক্তি খরচ হয়। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষার জন্য, টিসু গঠনের জন্য, শরীরের বিভিন্ন তরঙ্গ তৈরি, মায়ের দুধ তৈরি, সব ধরনের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া চলাফেরা, খেলাধুলা, কথা বলা এবং সব রকমের বাহ্যিক কাজের জন্যও শক্তির প্রয়োজন।

৪। অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে – আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, যার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্য গ্রহণের পর যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে তা হলো— শক্তি উৎপাদনের জন্য পুষ্টি উপাদান পুড়ে, পেশির সঞ্চালনের জন্য শক্তি ব্যবহৃত হয়, নতুন কোষ গঠন করে, বিভিন্ন ধরনের দেহ তরঙ্গ উৎপাদন ও নিষ্কাশন হয় ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্পাদন করতে কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন— খাদ্যের ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, খনিজ লবণ, প্রোটিন ও পানি এগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সঞ্চারিত করার কাজে সহায়তা করে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন এনজাইম ও হরমোনে উৎপাদনে বিভিন্ন প্রোটিন ও ধাতব লবণের ভূমিকা রয়েছে। এই এনজাইম ও হরমোনগুলো শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি – প্রতিদিনই আমাদের শরীর বিভিন্ন ধরনের অণুজীব দিয়ে বা সঙ্ক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য চাই শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। আর বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির খাদ্য গ্রহণের ফলে এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জিত হয়। খাদ্যের প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ দেহের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পুষ্টির খাদ্য গ্রহণে শরীর সহজেই সুস্থ থাকে অর্থাৎ শরীরের সঠিক সুস্থতা রক্ষা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের ফলে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। পুষ্টির অভাবে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং সহজেই অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। সঙ্ক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে কিছু কোষের মৃত্যু ঘটে এবং কখনো কখনো টিসুগুলো ধ্বংস হতে পারে। শরীরে নতুন কোষ গঠনের মাধ্যমে টিসুর ক্ষয়পূরণ করে থাকে, এক্ষেত্রে শক্তি, প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলতে পারি যে, খাদ্য শুধু ক্ষুধাই নিবৃত্ত করে না, শরীরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমাদের শরীরে কী কী কাজ করে থাকে তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখ।

পাঠ ২ – খাদ্যের উপাদান- প্রোটিন

খাদ্যকে ভাঙলে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায়। খাদ্যের মধ্যে যেগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাদের পুষ্টি উপাদান বা খাদ্য উপাদান বলে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলো প্রধানত ছয় প্রকার। যথা—

| (১) প্রোটিন | (২) কার্বোহাইড্রেট | (৩) ফ্যাট | (৪) ভিটামিন | (৫) খাতব লবণ | (৬) পানি |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|-------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|----------|

এগুলো আমাদের শরীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ছয়টি পুষ্টি উপাদানের প্রতিটিই আমাদের দেহে একাধিক কাজ করে থাকে। আমরা এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রোটিন

‘প্রোটিন’ শব্দটা গ্রিক শব্দ প্রোটিনজ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সর্বপ্রথম অবস্থান। যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব সেখানেই থাকে প্রোটিন। তাই প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। প্রাণি এবং উদ্ভিজ্জ জগতে প্রোটিন একটা প্রধান অংশ। এজন্য প্রোটিনকে মুখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রোটিনের গঠন – সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালফার, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ যুক্ত থাকে। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে অ্যামাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়।

অ্যামাইনো এসিড – বড় আকারের এক একটা প্রোটিনকে অর্ধ বিশ্রেণিত করলে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসিড অণু পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটা অণুতে কমপক্ষে একটা অ্যামাইনো দল ($-NH_2$) ও একটা কার্বনিক দল ($-COOH$) বিদ্যমান থাকে। এদের অ্যামাইনো এসিড বলে। অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ও অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড।



ক) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড – কতগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় না ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মিটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।

খ) অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড – কতগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মিটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ না করলেও কোনো সমস্যা হয় না। ওই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড বলে।

প্রোটিনের শ্রেণি বিভাগ

(ক) উৎস অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ -

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় -

- (১) প্রাণিজ প্রোটিন - যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন।
- (২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন - উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে। যেমন- ডাল, বাদাম, সরিষাবিন, সিমের বিচি ইত্যাদি খাদ্যের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।
- (খ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস -
অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

- (১) সম্পূর্ণ বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন - যে সব প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের উপযোগী অনুপাতে বর্তমান থাকে সেই প্রোটিনকে সম্পূর্ণ প্রোটিন বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলে। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে বর্তমান থাকে। এই জন্য এই প্রাণিজ প্রোটিনগুলো সম্পূর্ণ বা প্রথম শ্রেণির প্রোটিন।
- (২) আংশিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন - কোনো কোনো প্রোটিনে একটা বা দুইটা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড দেহ গঠনের জন্য উপযোগী অনুপাতে থাকে না কলে দেহের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এই সব প্রোটিনকে কম উপযোগী বা আংশিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলে। যেমন-চাল, ডাল, আটা, বাদাম, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভিদজাত প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো কম পরিমাণে থাকে। যেমন- ভালে মেথিওনিন, চালে লাইসিনের পরিমাণ কম থাকে।
- (৩) অসম্পূর্ণ বা তৃতীয় শ্রেণির প্রোটিন - যে প্রোটিনে দেহের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো এসিডগুলো পরিমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না সেগুলোকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। যেমন- জুয়ার প্রোটিন জেইন (Zein)।

প্রোটিনের উৎস-

প্রাণিজ প্রোটিন - মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, গনির, ছানা ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন - বিভিন্ন ধরনের ডাল, সরিষাবিন, বাদাম, চাল, গম ইত্যাদিতে প্রোটিন পাওয়া যায়।



প্রোটিন আত্মীয় খাদ্য

প্রোটিনের কাজ -

- ১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন - প্রোটিনের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দেহ কোষের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করা। আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্ত কণিকা হতে শুরুর করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

- ২। ক্ষয় পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে – আমাদের কোষগুলি প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষ গঠন করে ক্ষয়পূরণের কাজ করে প্রোটিন। কোনো ক্ষতস্থান সারাতেও প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।
- ৩। তাপশক্তি উৎপাদন – ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।
- ৪। দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন – বাইরের বিভিন্ন রোগজীবাণু নানা-ভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে নানা রকমের রোগব্যাদি ছন্ডাতে পারে। এইসব রোগ-জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য দেহে তাদের বিরোধী পদার্থ বা এন্টিবডি তৈরি করা প্রোটিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- ৫। মনন শক্তির বিকাশ – মানসিক বিকাশেও প্রোটিন অপরিহার্য। মানসিক বিকাশ বা মস্তিস্কের বিকাশের সময় প্রোটিনের অভাব হলে বৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়।
- ৬। দেহাত্মকত্বের কাজ নিয়ন্ত্রণ – প্রোটিন দিয়ে তৈরি এনজাইম, হরমোন, ইত্যাদি দেহাত্মকত্বের বিভিন্ন কাজকর্ম সুপরিচালিত করে থাকে।
- ৭। প্রয়োজনীয় উপাদান পরিবহন করে – রক্তের প্রোটিন হিমোগ্লোবিন বাতাস থেকে প্রাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।
- ৮। দেহে পানির সমতা রক্ষা করে – প্রাজমা বা রক্তের প্রোটিন দেহে পানির সমতা বজায় রাখে।

অভাবজনিত লক্ষণ–

শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে–

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। • ওজন কমে যায়। • চামড়া খসখসে হয়। • চুলের রং ক্যাকাশে হয়। • মেজাজ বিটবিটে হয়। | <ul style="list-style-type: none"> • মানসিক বিকাশ পিছিয়ে পড়ে। • প্রোটিনের ঘাটতিতে এনজাইমের সংশ্লেষণ কমে যায়। • খাদ্য ঠিকমতো পরিপাক হয় না, বদহজম হয়। • রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। |
|--|---|

প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়, যাকে প্রাক-কোয়াশিয়রকর অবস্থা বলে।



ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশু



কোয়াশিয়রকরে আক্রান্ত শিশু

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে শিশুর উপরের লক্ষণগুলোর পাশাপাশি হাত-পা ফুলে যায়, মুখে পানি আসে এই অবস্থাকে কোয়াশিয়রকর বলা হয়। সাধারণত ১-৪ বছরের শিশুরাই এর শিকার হয়।

এ ছাড়া প্রোটিন ও ক্যালরি উভয়েরই অভাব হলে ম্যারাসমাস দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে শিশুর শরীর খুবই শুকিয়ে যায়। বৃন্দাদের মতো চেহারা হয় ও বর্ধন ব্যাহত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাব -

- শোথ (হাতে পায়ে পানি আসে) হতে পারে।
- রক্তসম্প্রদায় দেখা দিতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ - আমাদের দেহে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

পাঠ-৩ : কার্বোহাইড্রেট

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই উপাদান অন্যান্য উপাদানের চেয়ে দামেও সস্তা। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য গুরুত্ব বেশি।

কার্বোহাইড্রেটের গঠন -

সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সংক্লেষে গঠিত। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণত ২ঃ১ অনুপাত অর্থাৎ এইগুলো পানিতে যে অনুপাতে থাকে কার্বোহাইড্রেটেও সেই অনুপাতে থাকে। তাই কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রেট অব কার্বন (Hydrate of carbon) বা কার্বনের পানি বলে। অর্থাৎ বলা যায় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনমুক্ত কোনো পদার্থে যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ঃ১ অনুপাতে থাকে তবে ওই পদার্থকে সাধারণত কার্বোহাইড্রেট বলা হয়।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ - কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

| (১) মনোস্যাকারাইড | (২) ডাইস্যাকারাইড | (৩) পলিস্যাকারাইড |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|

১। মনোস্যাকারাইড - যে সব কার্বোহাইড্রেট একটি মাত্র সরল শর্করার অণু দিয়ে গঠিত এবং একে অর্ধবিশ্লেষিত করলে ক্ষুদ্রতম কোনো সরল শর্করার অণু পাওয়া যায় না তাকে মনোস্যাকারাইড বা এক-শর্করা বলে। যেমন- গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

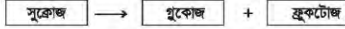
(ক) গ্লুকোজ (Glucose) - এটি কার্বোহাইড্রেটের সবচেয়ে বেশি পরিচিত সরল হাইড্রোকার্বন। গ্লুকোজ পাওয়া যায়- দানা শস্যে, কিছু পরিমাণ মূলে, আছুরে ও বিভিন্ন ফলে।

(খ) ফ্রুকটোজ (Fructose) - মধু, পাকা মিষ্টি স্বাদের ফলে এবং কিছু কিছু সবজিতে ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।

(গ) গ্যালাকটোজ (Galactose) - দুধের চিনি (ল্যাকটোজ) ভেঙে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়। উদ্ভিদে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায় না।

২। ডাইস্যাকারাইড - যেসব কার্বোহাইড্রেটকে অর্ধবিশ্লেষণ করলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন- সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

(ক) সুক্রোজ (Sucrose) – সাধারণ চিনি, আম, বিট, নানা প্রকার সবজি ও ফলের রসে সুক্রোজ পাওয়া যায়। সুক্রোজ ভাঙলে ১ অণু গ্লুকোজ ও ১ অণু ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।



(খ) ল্যাকটোজ (Lactose) – দুধে এই চিনি পাওয়া যায়। ল্যাকটোজকে ভাঙলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়।



(গ) মলটোজ (Maltose) – স্টার্চ ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তরে মলটোজের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মলটোজ ভাঙলে দুই অণু গ্লুকোজ পাওয়া যায়।



৩। পলিস্যাকারাইড

যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে অর্ধবিশ্লেষিত করলে অনেক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাকারাইড বা বহু শর্করা বলা হয়। যেমন- (ক) স্টার্চ (খ) গ্রাইকোজেন ও (গ) সেলুলোজ।

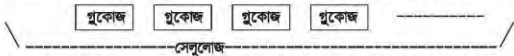
(ক) স্টার্চ (Starch) – প্রাণিজগতের শক্তির প্রাথমিক উৎস হলো স্টার্চ বা শ্বেতসার। উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট স্টার্চ হিসেবে সঞ্চিত হয়। এদের ভাঙলে অনেক গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। চাল, গম, আলু, কুমড়া ক্যাসাভা ইত্যাদি খাদ্যের অধিকাংশই স্টার্চ। দেহের মধ্যে এই স্টার্চগুলি এনজাইমের সাহায্যে অর্ধবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রাণিজগতে স্টার্চ পাওয়া যায় না।



(খ) গ্রাইকোজেন (Glycogen) – প্রাণী দেহে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেটের নাম গ্রাইকোজেন। অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গ্রাইকোজেন হিসেবে প্রাণীর যকৃতে ও পেশিতে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিজ্জ জগতে গ্রাইকোজেন পাওয়া যায় না। আমরা যখন অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকি বা কঠিন পরিশ্রম করি তখন গ্রাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং আমাদের প্রয়োজন মেটায়।



(গ) সেলুলোজ (Cellulose) – সেলুলোজ অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদান কেবল উদ্ভিদে পাওয়া যায়, প্রাণিজগতে পাওয়া যায় না। খাদ্য শস্য যেমন- ধান, গম, যব, ছোলা এবং শাকসব্জি প্রভৃতির উপরের কঠিন অংশটা সেলুলোজ। মানবদেহে সেলুলোজ ভাঙার মতো এনজাইম না থাকায় আমাদের দেহ সেলুলোজকে ভাঙতে পারে না। তবে মল নিষ্কাশণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।



কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস- নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো-

- ১। চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি।
- ২। সাগু, এরাহুট।
- ৩। চাল, ভুট্টা, যব, গম।
- ৪। আলু
- ৫। বিভিন্ন ধরনের শূকনা বন্য যেমন- বেংলুর, কিসমিস ইত্যাদি।
- ৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বালাম।
- ৭। টাটকা বন্য, আলুর, কলা, অংশন, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।
- ৮। সবুজ শাকসবজি, যেমন- লালশাক বা গুঁইশাক, কলমি শাক, পালং শাক, বাঁধাকপি, পটোল, কুমড়া ইত্যাদি।



কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০-৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ -

- (১) সেহে ভাণ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।
- (২) কার্বোহাইড্রেটসমূহ স্নেহ পদার্থ সহনে সহায়তা করে আমাদের ক্রিটোসিস নামক রোগ হতে রক্ষা করে।
- (৩) প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে।
- (৪) অল্প প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের প্রোটিনকে ভাণ উৎপাদনের কাজ থেকে বিরত রাখে, ফলে প্রোটিনের খরচ হয় না। কার্বোহাইড্রেটের এই কাজকে প্রোটিনের যিভব্যাক্সী কাজ (Protein sparing action) বলা হয়।
- (৫) কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতিতে এক প্রকার জীবাণু করে ভিটামিন 'কে' এবং ভিটামিন 'বি' উৎপন্ন করে ওই সমস্ত ভিটামিনের অভাব কিছুটা পূরণ করে থাকে।
- (৬) সেনুলোজ - জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য সূর করে।
- (৭) কার্বোহাইড্রেট যকৃতক ব্যাকটেরিরা ঘাটত বিক্রিয়া হতে রক্ষা করে।
- (৮) মস্তিস্কের কাজ চালু রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ-জাতীয় কার্বোহাইড্রেট-এর জুমিক গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের অভাবের ফল -

- (১) কার্বোহাইড্রেটের অভাবে সেহে ভাণশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- (২) আহারের সেনুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

কম্ব - কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট বেশি উপকারী এবং কেন?

পাঠ-৪ : লিপিড বা ফ্যাট ও ভিটামিন

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহপদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুতেই মধ্য এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলোকে ভাজলে ফ্যাট এসিড ও গ্লিসারল পাওয়া যায়।

স্নেহপদার্থের শ্রেণিবিভাগ -

ক) স্নেহপদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ - স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) কঠিনস্নেহ - যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিকভাবে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় তাদেরকে কঠিনস্নেহ বলে। যেমন- প্রাণির চর্বি, মাখন ইত্যাদি।

(২) তরলস্নেহ - যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে তাদেরকে তরল স্নেহ বলে। যেমন- সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

খ) উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ - উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-উদ্ভিজ্জস্নেহ ও প্রাণিজস্নেহ

(১) উদ্ভিজ্জস্নেহ - যেসব স্নেহপদার্থ উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের উদ্ভিজ্জস্নেহ বলে। যেমন- নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

(২) প্রাণিজস্নেহ - যে সকল স্নেহপদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের প্রাণিজস্নেহ বলে। যেমন- গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস -

(১) প্রথম শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০%-১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০%-৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম, যেমন- চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্টা বাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫%-২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি। আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০%-২৫% স্নেহপদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত।

স্নেহপদার্থের কাজ -

১। স্নেহপদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহপদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। দেহে শক্তির উৎস হিসেবে জ্বালানিরূপে সঞ্চিত থাকে।

২। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড জাতীয় স্নেহ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে- কে দ্রবীভূত করে দেহের গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।

৪। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সঞ্চারণের জন্য স্নেহপদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৫। দেহ থেকে তাপের অণুচর রোধ করে শরীর গরম রাখে।

৬। স্নেহহর্দ্য প্রয়োজনীয় ক্যাটি এসিড সরবরাহ করে চর্বিরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

অত্যাবশ্যকীয় ফল –

১। স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব দেখা যায়।

২। ত্বক শুকনো ও খসখসে তব ধারণ করে। অত্যাবশ্যকীয় ক্যাটি এসিডের অভাবে শিশুদের দেহে একজিমা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৫ : ভিটামিন

দীর্ঘদিন পুষ্টিবিদগণ লক্ষ্য করে গেছে যে আমাদের প্রকৃতিপ্রাপ্ত খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ক্যাটি ছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে যার অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন- বেরিবেরি, রাতকানা, রিকেট, এনিমিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা যায় এবং নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপাদান গ্রহণে তা ভালো হয়ে যায়। এই উপাদানগুলো হচ্ছে ভিটামিন। অর্থাৎ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয় ও সুস্থ সাক্ষাৎক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই যৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা যায়। মেহে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটার চাহিদা কিছু খুব সামান্য। কিন্তু এর ক্ষমতা সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাজই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুস্থভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ – দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-



ভিটামিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফলমূল

১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন – যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় তাদের চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪ টি, যথা- এ, ডি, ই, ও কে।

২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন – যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অদ্রবণীয় তাকে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন প্রধানত ২ টি। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি।

ভিটামিনের কাজ –

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- দেহের বৃদ্ধিসাধন করে। গর্ভাবস্থায় শিশুর গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।
- প্রাণির বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন গুণি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

কাজ – আমাদের দেহের জন্য স্নেহপদার্থ কেন প্রয়োজন বর্ণনা কর।

কাজ – মানবদেহে ভিটামিন কী কী কাজ করে লেখ।

পাঠ-৬ : ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’**ভিটামিন ‘এ’**

ভিটামিন-এ চর্বিতে দ্রবণীয় একটি অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। ভিটামিন এ-এর রাসায়নিক নাম রেটিনল। এটি বর্ণহীন ও তাপে কম নষ্ট হয়। তবে উচ্চ তাপে ও অতিবেগুনি রশ্মিতে নষ্ট হয়।

ভিটামিন এ র কাজ–

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার জন্য এই ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। • জীবদেহের সার্বিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। • ত্বক ও ঝিল্লির কোমলতা ও সজীবতা রক্ষা করে। | <ul style="list-style-type: none"> • বিভিন্ন গ্রন্থিকে স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম রাখে। • বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণ রোধ করে। • রাতের বেলায় বা অন্ধকারে অল্প আলোতে দেখতে ভিটামিন-এ সহায়তা করে। |
|--|--|

খাদ্য উৎস – ভিটামিন এ এর উৎসকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- (১) **প্রাণিজ উৎস –** ভিটামিন এ প্রাণিজ খাদ্যে এবং কোনো কোনো প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ডিম, কলিজা, চর্বিযুক্ত মাছ, সামুদ্রিক মাছ এর কলিজায়, হলিবার্ট ও শার্ক ইত্যাদি মাছের তেল, ইলিশ মাছ, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। দুধে বিশেষ করে কোলোস্ট্রামে বাথেন্ট ভিটামিন এ থাকে।
- (২) **উদ্ভিজ্জ উৎস –** উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে হলুদ, কমলা বা হলদে-কমলা বর্ণের এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ বা রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেনুলো খাওয়ার পর মানবদেহে ভিটামিন-এ, তে রূপান্তরিত হয়। এদের ক্যারটিন বা প্রাক ভিটামিন-এ বলে। সবুজ বা রঙিন শাক সবজি, হলুদ ফলমূল, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, মিষ্টি আলু, পাকা পেঁপে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রাক ভিটামিন-এ বিদ্যমান।

অভাবজনিত লক্ষণ –

- ১) ভিটামিন-এ এর অভাবে রাতকানা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ হলে রাতের বেলায় অন্ধ আলোতে বা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা ঘটে।
- ২) এ ছাড়া ভিটামিন-এ এর অভাবে চোখের ঝিল্লি শুষ্ক হয়ে প্রদাহ দেখা দেয়, যাকে ক্ষেরোপথ্যালমিয়া বলে।
- ৩) ভিটামিন এ-এর অভাবে চোখের পর্দার অস্বচ্ছতাও হতে পারে। একে কেরাটোম্যাপেসিয়া বলে।
- ৪) এই ভিটামিনের অভাবে চামড়ার শুষ্কতা হতে পারে।
- ৫) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- ৬) ভিটামিন-এ এর ঘাটতি হলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।



ভিটামিন-এ'র অভাবে সূঁচ চোখের বিভিন্ন রোগ

ভিটামিন-‘ডি’

ভিটামিন-ডি এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরোল। এটা রিকট রোগ প্রতিরোধ করে বলে এই ভিটামিনকে রিকট রোগ প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। এটা চর্কিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় নয়। তাপে নষ্ট হয় না।

ভিটামিন-ডি এর কাজ –

- ভিটামিন-ডি অস্ত্র হতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি লবণ শোষণে সহায়তা করে।
- দাঁত ও হাড়ের গঠন ও পুষ্টিসাধনে ভিটামিন-ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- প্যারাথাইরয়েড হরমোনের কাজে সহায়তা করে।
- রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

উৎস –

- কড মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল, হ্যাশিবার্ড মাছের তেল ভিটামিন-ডি এর প্রধান উৎস। এ ছাড়া লিভার, দুধ, দুধজাত খাদ্য, ডিমের কুসুম ইত্যাদি এই ভিটামিনের উৎস।
- আমাদের ত্বকের নিচে কোলেস্টেরল থাকে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায় কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়।

অভাবজনিত রোগ –

- ১) রিকট – ভিটামিন-ডি এর অভাবে শিশুদের রিকট হয়। এই রোগে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়–
 - শিশুর হাড় নরম ও অপরিণত হওয়ার ফলে শরীরের বৃদ্ধি হয় না।
 - পায়ের হাড়গুলো বেকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়।
 - বুকটা সরু ও অস্বাভাবিক আকৃতি লাভ করে।
 - দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের গঠন ব্যাহত হয়।
 - ছোট শিশুদের হাঁটতে দেরি হয়।



রিকট অস্বাভাবিক শিশুর পায়ের হাড়গুলো বেকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়েছে।

২) অস্টিওম্যালাসিয়া – এই রোগ গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও বয়স্কদের হয়। এর লক্ষণগুলো হলো–

- হাড় হতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হয়ে যায় ফলে ক্রমশ হাড় নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- এই রোগে ক্রমশ পা দুর্বল হয়ে পড়ে ও হাতের উপর ভর দিয়ে চলতে হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেকে যেতে পারে।
- কোমরে ও পায়ে ব্যথা হতে পারে।

কাজ – ভিটামিন-এ ও ডি এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৭ : ভিটামিন ‘ই’ ও ‘কে’

ভিটামিন ‘ই’

ভিটামিন-ই এর আর এক নাম টোকোফেরল। এটি চর্বিতে দ্রবণীয় ও পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন।

উৎস – ভোজ্য তেল যেমন- সয়াবিন তেল, গমের জার্ম তেল ভিটামিন-ই-এর সবচেয়ে ভালো উৎস। গমের অঙ্কুর, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুটি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শাকসবজি, ফল, যকৃৎ, ভিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদিতে ভিটামিন-ই পাওয়া যায়।

ভিটামিন-ই এর কাজ–

- এই ভিটামিন কোষগুলোকে জারণজনিত বিক্রিয়ার কারণে ক্ষতের হাত থেকে রক্ষা করে।
- কোষের মেমব্রেনের গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।
- দেহের কোষে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলোকে জারণের হাত থেকে রক্ষা করে।
- লোহিত রক্ত কণিকাকে বিভিন্ন জারক পদার্থের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- প্রাণির কণ্ডু রোধ করে।
- ভিটামিন-এ এবং ক্যারটিনের জারণ রোধ করে।
- যকৃৎকে বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানের প্রভাবে ক্ষত হওয়া থেকে রক্ষা করে ভিটামিন-ই।
- চোখের ছানি পড়া রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা –

- স্ট্রী ও পুরুষের কণ্ডু দেখা দিতে পারে।
- অকাল বার্ধক্য দেখা দিতে পারে ফলে দেহ ও মন নিস্বেচ্ছ হয়ে পড়ে।
- ভিটামিন-ই-এর অভাবে অসময়ের গর্ভপ্ৰাব হয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কাজ – ভিটামিন-ই আমাদের দেহে কী ধরনের কাজ করে লেখ।

ভিটামিন-কে

ভিটামিন-কে –এর রাসায়নিক নাম ফাইটল ন্যাপথোকুইনোন। একে রক্তক্ষরণ নিবারক ভিটামিন বা অ্যানটি হেমারেজিক ভিটামিনও বলা হয়। এটি হৃদয় বর্গের, চর্বিতে দ্রবণীয় এবং পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন। তাপে, বাতাসে ও অর্ধপ্রত্যয় ভিটামিন-কে নষ্ট হয় না, তবে আলোতে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-কে খুব কম নষ্ট হয়।

উৎস – উদ্ভিদের সবুজ পাতা ও গাঁজানো খাবারে ভিটামিন-কে পাওয়া যায়। সবুজ রঙের শাক, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন-কে পাওয়া যায়। লেটুস পাতা, পালং শাক, টমেটো, শালগম পাতা, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে ভিটামিন কে পাওয়া যায়। প্রাণীজ উৎসের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ-জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন-কে থাকে।

ভিটামিন-কে এর কাজ-

- ভিটামিন-কে এর প্রধান কাজ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করা। এই ভিটামিনের প্রভাবে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রোথামিন নামক প্রোটিন তৈরি হয়।
- পিষ্টের স্বাভাবিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন-কে এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত ফল -

| | |
|--------------------------------------|--|
| • রক্তে প্রোথামিনের পরিমাণ কমে যায়। | • কেটে গেলে বা ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না। |
| • পিণ্ড নিঃসরণ ব্যাহত হয়। | |

কাজ - ভিটামিন কে এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৮ : ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স - বি_১ ও বি_২

ভিটামিন ‘বি’ কোনো একক ভিটামিন না। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে নিচে উল্লেখযোগ্য ৬ টি বি-ভিটামিনের নাম দেওয়া হলো।

| ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • থায়ামিন বা ভিটামিন বি_১ • রিবারফ্লাভিন বা ভিটামিন বি_২ • ন্যাসিন | <ul style="list-style-type: none"> • ফলিক এসিড • ভিটামিন বি_৬ • ভিটামিন বি_{১২} |

ভিটামিন-বি_১

ভিটামিন-বি_১ এর রাসায়নিক নাম থায়ামিন। এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় ও বেশি তাপে নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য বেশি খুলে এবং অনেক বেশি তাপে বেশি সময় ধরে রান্না করলে বি_১ নষ্ট হয়ে যায়।

| টিটামিন-বি _১ এর কাজ | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ধার্মিকের প্রধান কাজ হলো কার্বোহাইড্রেট বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে শক্তি মুক্ত করে। • শারীরিক ক্ষুধা বজায় রাখতে সাহায্য করে। | <ul style="list-style-type: none"> • স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখে। • হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। |

খাদ্য উৎস -

উজ্জ্বল উৎস - টেকিহাঁটা চাল, আটা, ছোলা, ভাত, বাদাম, সরিষা, মটর ভাত, আলু ইত্যাদি।

প্রাণিক উৎস - মৎস্য, হৃৎপিণ্ড, বৃদ্ধ, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা -

ক) ধার্মিকের অল্প ঘাটতি হলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়-

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • শারীরিক ও মানসিক অবসাদ • শিটশিটে মেজাজ • অনিদ্রা | <ul style="list-style-type: none"> • ক্ষুধামন্দা • ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা • বুক খড়খড় সেখা দেয় |
|--|---|

খ) ধার্মিকের খুব বেশি অভাব হলে আমাদের সাথে বেরিবেরি নামক রোগের সৃষ্টি হয়। বেরিবেরি ২ ধরনের হয়। যথা - তিজা বেরিবেরি ও শুকনা বেরিবেরি।

গ) ধার্মিকের খুব বেশি অভাব হলে আমাদের সাথে বেরিবেরি নামক রোগের সৃষ্টি হয়। বেরিবেরি ২ ধরনের হয়। যথা - তিজা বেরিবেরি ও শুকনা বেরিবেরি।

বেরিবেরি লক্ষণগুলো হলো -

- হাত-পা অবশ হতে যায়।
- হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখা যায়।
- তিজা বেরিবেরিতে হাত পায়ে পানি জমে যায়।
- স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হয় ও পেটে প্যারালিসিস দেখা যায়।
- এনিমিয়া দেখা যায়।
- পরিশেষে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এই রোগ যে কোনো বয়সে এমনকি শিশুদেরও হতে পারে।



বেরিবেরি

কাজ - টিটামিন-বি_১ এর অভাবে আমাদের সাথে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন কর।

ভিটামিন-বি২

ভিটামিন-বি২ এর রাসায়নিক নাম রিবেফ্লাভিন। হালকা হলুদ বর্ণের ও তাপে সহনশীল।

ভিটামিন-বি২ এর কাজ-

- এর প্রধান কাজ হলো অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি মুক্ত করতে এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।
- ত্বকের সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষা করে এবং মিউকাস মেমব্রেনকে সুস্থ রাখে।
- স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।
- সুষ্ঠু পরিপাক ক্রিয়ার জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।

উৎস -

ক) প্রাণিজ উৎস - দুধ এই ভিটামিনের উৎকৃষ্ট উৎস। এ ছাড়া কলিজা, পনির, ডিম, মাছ, মাংস ও বৃক উল্লেখযোগ্য।

খ) উদ্ভিজ উৎস - উদ্ভিজ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ভাল, শিম ও অবক্ষুরিত শস্যে পাওয়া যায়।

অভাবজনিত অবস্থা -

- রিবেফ্লাভিনের অভাবে দেহের বৃন্দ্রি ব্যাহত হয়।
- এর অভাবে ঠোটের কোনায় ঝা হয়। যাকে অ্যাংগুলার স্টমাটাইটিস বলে।
- বি২-এর অভাবে মুখে ও জিহবা মেজেন্টা বর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থাকে গ্লসাইটিস বলে।
- অকালে চুল উঠে যায়।
- চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চোখ জ্বালা করে, চোখে ছানি পড়ে ও দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়।



অ্যাংগুলার স্টমাটাইটিস



গ্লসাইটিস

কাজ - ভিটামিন-বি২ এর অভাবজনিত সমস্যাগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ-৯ : ভিটামিন সি

ভিটামিন-সি এর রাসায়নিক নাম এসকরবিক এসিড। ভিটামিন সি পানিতে দ্রবীয় এবং তাপে নষ্ট হয়ে যায়, স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে বলে একে স্কার্ভি প্রতিরোধী ভিটামিন বলে।

উৎস-

উদ্ভিজ উৎস - আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, লেবু, টমেটো, কমলালেবু, তাজা শাকসবজি, ধনেপাতা, বাধাকপি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

প্রাণীজ উৎস – প্রাণীজ উৎসে ভিটামিন-সি কম পাওয়া যায়। মায়ের দুধে ভিটামিন-সি বিদ্যমান।

কার্যকারিতা –

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বজায় রাখে। • হাড়ের টিসু গঠনে ও পুষ্টি সাধনে কাজ করে। • ভিটামিন-এ, ই এবং বি কমপ্লেক্সে-এর জারণ প্রতিহত করে। • রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে সাহায্য করে। | <ul style="list-style-type: none"> • কোলেস্টেরল বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। • ক্ষত স্থান শুকাতো সাহায্য করে। • সৌহের শোষণ বৃদ্ধি করে। |
|---|---|

অভাবের ফল – ভিটামিন-সি এর গুরুতর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। যে কোনো বয়সেই এই স্কার্ভি রোগ হতে পারে। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো–

- দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে।
- দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে।
- দাঁত পড়ে যায়।
- এনিমিয়া দেখা যায়।
- হাত ও পা-এর গাঁটে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়।
- সহজে ক্ষত শুকাতো চায় না ভাঙ্গা হাড় সহজে ছোঁড়া লাগতে চায় না।
- চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে কালচে দাগ হয়।
- সহজেই সর্দি-কাশি হয় এবং বিভিন্ন রোগে অরোগ্য হয়।



স্কার্ভিতে দাঁতের মাড়ি ফুলে ওঠা



স্কার্ভিতে চামড়ার পরিবর্তন

কাজ – আমাদের দেহে ভিটামিন-সি এর ঘাটতি হলে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে লেখ।

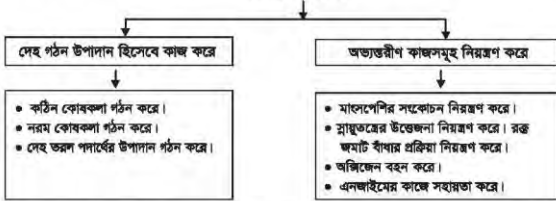
পাঠ-১০ : খনিজ লবণ-ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম, পৌষ, ম্যাগনেশিয়াম, তাম্র, আয়োডিন, দস্তা, এলুমিনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। কোনো খাদ্যবস্তু পোড়ালে যে সাদা ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাকে খনিজ পদার্থ বা অজৈব লবণ বলে। পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রধান খনিজ লবণ – অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

- (২) শৈশুমৌল খনিজ লবণ – লৌহ, আয়োডিন, ক্রোরিন, জিংক, ম্যাগনিসিয়াম, তাম্র, কোবাল্ট, মশিভডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পুষ্টি কাজে অংশ নেয় বসে এসব মৌলকে শৈশুমৌল বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ পদার্থের কাজ



আমরা এখন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন, জিংক, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম নিয়ে আলোচনা করব।

ক্যালসিয়াম– খনিজ লবণের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম দাঁতে এবং হাড়ে এবং ১% থাকে রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে ও কোমল তন্তুতে।

উৎস–

- ক) **প্রাণিজ উৎস** – দুধ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন– দই, ছানা, পনির, মাওয়া, কাঁটাসহ ছোট মাছ ও হাড় ক্যালসিয়াম থাকে।
- খ) **উদ্ভিজ উৎস** – সবুজ শাকসবজি, লবণ, কলমি শাক, ডাটা শাক, গুঁইশাক, লাশপাক, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। সবজির মধ্যে টেডুশ, ধুন্দুল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম ইত্যাদি সবজি, ছোলা, মাষকলাই, মুগ, ও সয়াবিনে ক্যালসিয়াম থাকে।

কার্যকারিতা –

- দাঁত ও হাড়ের গঠনে সহায়তা করা।
- রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সাহায্য করে।
- কোনো কোনো এনজাইমকে সক্রিয় করে।

অতর্কের ঝল –



রিকেটস্



রিকেটস্ এ প্রকৃত পিতুর
পায়ের এল-এর এর চিত্র



ক্যালসিয়ামের অভাবে
অস্টিওম্যালেশিয়া প্রকরণ

- ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের পুষ্টি ব্যাহত হয়।
- দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়।
- শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়।
- শিশুদের বর্ধন ব্যাহত করে।
- ক্যালসিয়ামের দীর্ঘমেয়াদি ঘাটতির ফলে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে।
- বয়স্ক ব্যক্তিদের ওস্টিওম্যালোসিয়া নামক রোগ দেখা দেয়।
- শরীরের কাটা স্থান থেকে রক্ত পড়া সহজে বন্ধ হয় না।

ফসফরাস – দেহের খনিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান। আমাদের দেহে জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের বৌগ হিসেবে ফসফরাস বিদ্যমান।

উৎস – প্রাণিজ উৎসের মধ্যে দুধ, ডিম, মাংস, যকৃৎ, মাছ এবং উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ডাল, টেকি ছাঁটা লিন্থ চাল, মটরশুঁটি, ফুলকপি, গাজর ইত্যাদিতে ফসফরাস পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা –

- দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজ সম্পর্কযুক্ত।
- দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- দাঁত ও হাড় গঠনে ক্যালসিয়ামের সাথে ফসফরাস
- কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ বিপাকে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- কাজ করে।
- জীবকোষ সৃষ্টি ও দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়।
- খাদ্যদ্রব্য থেকে দেহে শক্তি মুক্ত হতে সাহায্য করে।
- দেহে কোনো কোনো অ্যানাভাইমের কাজে সহায়তা করে।
- দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ফসফরাস অপরিহার্য।
- স্নায়ুকোষের সুস্থতা রক্ষায় এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত অবস্থা – সাধারণত ফসফরাসের অভাব খুব একটা দেখা যায় না।

কাজ – ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে লেখ।

পাঠ-১১ : লৌহ ও আয়োডিন

লৌহ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ৩-৫ গ্রাম লৌহ থাকে। মানুষের দেহের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ লেশমৌল। মোট লৌহের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৫% লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন অণুতে বর্তমান থাকে। প্রায় ৫% পেশিতে থাকে।

উৎস –

প্রাণিজ উৎস – যকৃৎ, বৃক ও হৃৎপিণ্ডে লৌহ থাকে। দুধে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ উৎস – সবুজ শাকসবজি, ডাল, শস্য, আপেল, গুড়, শূকনা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ থাকে।

কার্যকারিতা -

- রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য পৌঁছ প্রয়োজন।
- কিছু কিছু এনজাইমের কাজে সহায়তা করে থাকে।
- জীবিত প্রাণিকোষের স্বসংগঠন জন্য অপরিহার্য।

অভাবজনিত লক্ষণ - খাদ্যে দীর্ঘদিন লৌহের অভাব ঘটলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। এর ফলে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো-

- শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষুধাহীনতা থাকে।
- শিশুদের দেহের বর্ধন ব্যাহত হয়।
- শরীর দুর্বল লাগে ও চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়।
- কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও হতে পারে।

কাছ - লৌহের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন কর।

আয়োডিন

মানুষের দেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২-১৫ মিলিয়াম। শরীরের পুষ্টির জন্য আয়োডিন একটি অত্যাবশ্যকীয় লেশমৌল। দুই-তৃতীয়াংশ আয়োডিন থাকে থাইরয়েড গ্রন্থিতে।

উৎস - সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকার শাকসবজি ও পশুর মাংসে পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা -

আয়োডিন দেহে থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরজিন হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। আয়োডিন যুক্ত এই হরমোন মানবদেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন-

- শিশুর দেহের স্বাভাবিক বর্ধনের জন্য প্রয়োজন।
- দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
- মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর বিকাশে সাহায্য করে।

অভাবজনিত সমস্যা - খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে যে সমস্যাপুলো হয় তা হলো-

- (১) **গলগন্ড বা গন্ডটান -** আয়োডিনের অভাব হলে গলগন্ড হয়। এই রোগে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরজিন হরমোন তৈরি হতে পারে না। ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি হরমোন তৈরির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলে গ্রন্থিটি বড় হয়ে যায়। ফলে বাইরে থেকে গলা ফুলে দেখা যায়। এ ছাড়া এই রোগে বৃশ্চি ও চলনশক্তি হ্রাস, মানসিক অক্ষমতা, তীব্রতাগামি, মাংসপেশির সংকোচন, স্নায়বিক দুর্বলতা এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- (২) **হাইপোথাইরয়েডিজম (থায়রয়েড গ্রন্থির কর্ম ক্ষমতা হ্রাস) -** দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী থাইরজিন হরমোন তৈরি না হলে এই অবস্থাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলে। এর লক্ষণ হলো- আলসেমি, শুকনা চামড়া, ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। এর প্রভাবে ছোট শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়।

(৩) ক্রেটিনিজম (হাংগোনা ও যামনজ) দেখা দিতে পারে।



আয়োডিনের অভাবে গরটর



একই বরসের আত্যাবিক উত্ভতার ব্যক্তি
মাংসখানে আয়োডিনের অভাবে সূষ্ট ক্রেটিনিজম
(হাংগোনা ও যামনজ) আক্যত ব্যক্তি

কাজ - আয়োডিনের অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে দেখ।

পাঠ ১২ - পানি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ কয়েক সপ্তাহ খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেয়ে এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫-৭৫% পানি দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল চিসুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মূত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সংরক্ষণ করে রাখতে পারে না। তাই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে প্রায় ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা প্রতিদিনের গ্রহণকৃত তরল ও পানীয় থেকে পেতে হবে। গড়ে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫-৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একজন আত্যাবিক সূস্থ মানুষের দিনে ৬-৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যায়-

- খুব বেশি পরম আবহাওয়ার কারণে অনেক ঘাম হলে।
- জ্বর হলে।
- ডায়রিয়া হলে ও বমি হলে।
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে।
- শরীরকৃতীয় খোশাশুলা করলে বা ঘাম ব্যরিয়ে ব্যায়াম করলে।
- খাবারে আঁশ-জাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে।

- সত্যদাত্রী মা সন্তানকে দুধ পান করালে।
- বীরা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩-৪ ঘন্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায় অর্থাৎ পানির চাহিদা বাড়ে।
- বিভিন্ন ধরনের ঔষধ সেবনের কারণেও পানির চাহিদা বাড়ে।

পানির উৎস – পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের রসাল ফল, যেমন– তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ–

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানি প্রয়োজন হয়।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করে।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা – শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতা বলে।

ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো–

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, অগ্নিতা, ব্যায়াম অথবা ছুরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্বাস্ত পরিমাণে পানি পান না করা বা খাদ্যে তরল জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি থাকা।
- ডায়রিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণগুলো হলো –

- মাথা ধরা
- দুর্বল লাগা
- ঠোট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়
- মূত্রের রং গাঢ় হয়।

ডিহাইড্রেশন থেকে শরীরে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে পর্বাস্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করা দরকার।

কাজ – আমাদের দেহে প্রতিদিন কী পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়? কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তা লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে?

- | | |
|----------------|-------------|
| ক) এনজাইম | খ) হরমোন |
| গ) হিমোগ্লোবিন | ঘ) এন্টিবডি |

২। খাদ্যের কোন উপাদানটি আমাদের দেহকে বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে?

- | | |
|------------|-------------------|
| ক) প্রোটিন | খ) কার্বোহাইড্রেট |
| গ) স্নেহ | ঘ) পানি |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসিমা খাতুন সব সময়ই শাকসবজি ছোট ছোট টুকরা করে কাটেন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে রান্না করেন। তা দেখে প্রতিবেশী আপা বলেন, “তোমার তৈরিকৃত খাদ্যে দরকারি একটি উপাদান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”

৩। নাসিমা খাতুনের রান্নায় খাদ্যের কোন উপাদানটির অপচয় হচ্ছে?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) ভিটামিন এ | খ) ভিটামিন সি |
| গ) ভিটামিন ই | ঘ) ভিটামিন কে |

৪। ওই পরিবারের সদস্যরা –

- চোখের সমস্যায়ে ভুগতে পারে
- অসময়ে দাঁত হারাতে পারে।
- সহজেই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

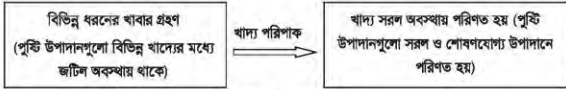
সুজনশীল প্রশ্ন

- ১। সানার বয়স পাঁচ বছর। তাকে তার সমবয়সীদের তুলনায় ছোট দেখায়। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে যায়। দিন দিন তার চুলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি সানার খাদ্যাভ্যাস জ্ঞানতে চান। সব শুনে তিনি সানার গৃহীত খাবারে একটি বিশেষ উপাদানের ঘাটতি রয়েছে বলে মাকে জানান এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সানাকে সেই উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন।
 - ক. কোনটি ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না?
 - খ. অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. সানার দেহে কোন উপাদানের অভাবে উল্লিখিত সমস্যাগুলো হচ্ছে। ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. সানার শারীরিক অবস্থা উন্নয়নে ডাক্তারের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর।
- ২। দশম শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণিমা পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর সে হেঁটে বাসায় ফেরে। তারপর অতি দ্রুত তার ঘামে ভেজা কাপড় পাল্টিয়ে সে আবার বাইরে শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়। এ সময়ে মা তাকে ডাবের পানি, লেবুর শরবত কিংবা ফলের সুপ-জাতীয় পানীয় খেতে দিলে পূর্ণিমা খেতে চায় না। দুপুর কিংবা রাতের খাবারের পরও সে পানি কম খায়। ফলে বেশ কিছুদিন যাবৎ তার শারীরিক সমস্যা হচ্ছে।
 - ক. সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদান কোনটি?
 - খ. খাদ্যই বেঁচে থাকার নিয়ামক—বুঝিয়ে লেখ।
 - গ. পূর্ণিমা কী ধরনের সমস্যায় ভুগছে? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. পূর্ণিমার শারীরিক সমস্যার সমাধান তার নিজের পক্ষেই করা সম্ভব—বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায় খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা

পাঠ-১ : খাদ্যের পরিপাক

বৈদ্যে ধাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। অধিকাংশ খাদ্যবস্তুই দেহে সরাসরি কাজে লাগে না। কারণ খাদ্য হিসেবে আমরা যেগুলো গ্রহণ করি, সেগুলোর অধিকাংশই বৃহৎ অণুবিশিষ্ট এবং এদের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। খুব সামান্য পরিমাণে কয়েকটি খাদ্যবস্তু যেমন – গ্লুকোজ ও কয়েকটি খনিজ লবণ সরাসরি কাজে লাগে। অধিকাংশ খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার পর তা শরীরের কাজে আসে। যেমন— ভাতের প্রধান পুষ্টি উপাদান স্টার্চ। ভাত খাওয়ার সাথে সাথেই এই স্টার্চ শরীরের কোনো কাজে আসবে না। কারণ স্টার্চ অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। তাই খাওয়ার পর স্টার্চ ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হলে দেহ গ্লুকোজ শোষণ করে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করবে। তেমনি খাদ্যে অবশিষ্ট বড় বড় প্রোটিন অণুগুলো ভেঙে অ্যামাইনো এসিডে এবং খাদ্যের ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হওয়ার পর এই সরল সরল উপাদান শোষিত হয়ে সরাসরি দেহের কাজে লাগবে।



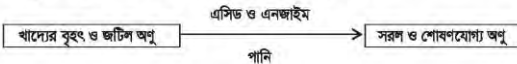
খাদ্য পরিপাকের পরিণতি

যে কোনো খাদ্য বস্তুকে শরীরে কাজে লাগানোর জন্য খাদ্যের বড় বড় অণুগুলো ভেঙে ছোট ছোট সরল অণুতে পরিণত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। খাদ্যের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত হয় পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে।

পরিপাক

খাদ্য উপাদানের বৃহৎ ও জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্র ও সরল অণুতে রূপান্তরিত হয়ে শরীরে শোষিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। বৃহৎ উপাদান থেকে ক্ষুদ্র ও সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার কাজে বিভিন্ন ধরনের এসিড ও এনজাইমের সাহায্যে ধাপে ধাপে বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। খাদ্যের এই জটিল উপাদান থেকে সরল উপাদানে পরিণত হওয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক ক্রিয়া বলে।

“যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুর বৃহত্তর জটিল অণুগুলো বিভাজিত হয়ে বা ভেঙে দেহের উপযোগী ও বিশেষণযোগ্য সরল ও ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক (Digestion) বলে”।

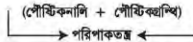


পরিপাক ক্রিয়া

পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গ্লুকোজে, প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো এসিড এবং ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে সকল খাদ্যবস্তুই ভেঙে সহজ উপাদানে পরিণত হয় এবং শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সকল খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

পরিপাকতন্ত্র

মানবদেহে পরিপাক ক্রিয়া শরীরের একটি মাত্র অংশে সংঘটিত হয় না। শরীরের বেশ কয়েকটি অংশ এই কাজের সাথে জড়িত। যেমন দাঁত দিয়ে চর্বনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু ছোট ও নরম করা হয়। অন্ত্রনালির মাধ্যমে চর্বিত নরম খাদ্যবস্তুগুলো পাকস্থলিতে আসে এবং পরিপাক ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না, তাই অপরিপাককৃত খাদ্যবস্তুগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে। এখানেই প্রধান পরিপাক কাজ চলে। এরপর বৃহদন্ত্রে খাদ্যবস্তুগুলো প্রবেশ করে এবং পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরিপাকের ফলে উৎপন্ন সরল উপাদানগুলো শরীরের মধ্যে শোষিত হয় এবং যে বস্তুগুলো পরিপাক ও শোষিত হয় না অর্থাৎ অপাচ্য দ্রব্যগুলো দেহ নিষ্কাশন করে। খাদ্যকে দেহের গ্রহণ উপযোগী করার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশে এই পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। “দেহের যে অংশের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু গ্রহণ, খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ এবং অপাচ্য অংশের নিষ্কাশন ঘটে, তাকে পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) বলে।” মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

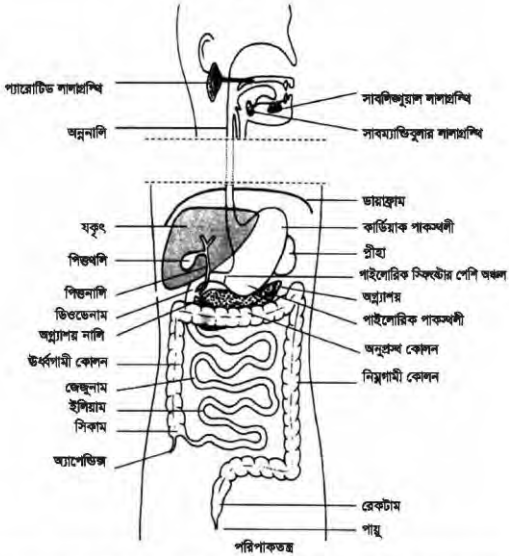


পৌষ্টিকনালির অন্তর্গত অঙ্গগুলো হচ্ছে মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র। আর পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো হচ্ছে লালগ্রন্থি, বকুৎ ও অগ্ন্যাশয়।

পৌষ্টিকনালি – মুখবিবর হতে মলদ্বার পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালিটিকেই পৌষ্টিকনালি বলে। নিম্নে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো –

| পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ক) মুখবিবর (Buccal cavity) | ঘ) পাকস্থলি (Stomach) |
| খ) গলবিল (Pharynx) | ঙ) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) |
| গ) অন্ননালি (Oesophagus) | চ) বৃহদন্ত্র (Large Intestine) |

পৌষ্টিকতন্ত্র
লালগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।



কাঁজ - আমাদের দেহে খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত অঙ্গগুলো বোর্ডে চিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত কর।

পাঠ ২ - কার্বোহাইড্রেট, ক্যাট ও প্রোটিন পরিপাক

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। পরিপাকের জন্য অপরিহার্য এনজাইমসমূহ লালারস, পাক রস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসে অবস্থিত। এ ছাড়া পিত্তরস পরিপাক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বিভিন্ন এনজাইমের উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে ও তিন গতিতে

পরিপাক হয়ে থাকে। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট পরিপাকের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। খাদ্য মুখগহ্বর হতে মলদ্বার পর্যন্ত আসার জন্য প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। নিম্নে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক (Digestion of Carbohydrates) - শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দৈনিক শক্তি চাহিদার ৬০%-৮০% কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্রহণ করি। কার্বোহাইড্রেট দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, মধু, ফল ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস। এ সকল খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের মাধ্যমে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং পরে শক্তি উৎপন্ন করে। মনোস্যাকারাইডের কোনো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। এরা সরাসরি রক্তে বিশ্লেষিত হতে পারে। ডাইস্যাকারাইড ভেঙে দুটি মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয় এবং পলিস্যাকারাইড ভেঙে প্রথমে ডাইস্যাকারাইড এবং পরে মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়।

পরিপাকতত্ত্বের বিভিন্ন অংশে কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of Fat) - ফ্যাটকে ঘনীভূত শক্তির উৎস বলা হয়। কারণ খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে থাকে। ফ্যাটের প্রধান উৎস হচ্ছে তেল, ঘি, মাখন, চর্কিত মাংস, তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুমু, দুধের সর ইত্যাদি। ফ্যাট-জাতীয় খাদ্য ভেঙে গ্লিসারল ও ফ্যাট এসিডে পরিণত হয়। পাকস্থলিতে পিত্তলবণের অত্যবধিকায় এখানে ফ্যাটের সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না।

প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Protein) - খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রাণি ও উদ্ভিদ কোষে প্রোটিন আছে। প্রোটিন এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। প্রোটিন সর্বাপেক্ষা জটিল জৈব পদার্থ। প্রোটিন পরিপাক হয়ে এর গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বড় বড় প্রোটিন অণু সরীসে কোনো কাজে লাগে না।

পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোটিন পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদান অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

কাজ - কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট পরিপাকের পর কী কী উপাদান উৎপাদিত হয়?

পাঠ-৩ : কিশোর-কিশোরীরা খাদ্য গ্রনিকল্পনা

শৈশব থেকে পূর্ণ বয়সে পরিনত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কালকে কৈশোর কাল বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর বয়স এই সময়টা হলো কৈশোর কাল। এই বয়সে শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয়। হেলেনের ক্ষেত্রে ১২-১৫ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০-১৩ বছর বয়সে বর্ধনের গতি সর্বোচ্চ হয়।

এই বয়সে বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তির চাহিদা বাড়ে, এ ছাড়া প্রোটিন, ভিটামিন ও খাতব লবণের চাহিদাও বাড়ে। এই বয়সের কিশোর-কিশোরী খেলাধুলা করে তাই তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে বলে শক্তির খরচ হয়। কিশোর-কিশোরীদের পেশির গঠন, দাঁত, হাড়, রক্ত গঠন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেশি হয়।

কিশোর-কিশোরীর গুটির গুরুত্ব -

- কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত কিলো ক্যালরি বা শক্তিসমৃদ্ধ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ।
- এই বয়সে শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, পড়ালেখা, বহিরাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য জীবনের অন্য সময়ের চেয়ে বেশি শক্তির অর্থাৎ কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়। এই বর্ধিত শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- কিশোর-কিশোরীদের ভিটামিন ও খাতবলবণ সমৃদ্ধ খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি কিশোর-কিশোরীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- এই বয়সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লৌহ ও ফলিক এসিড বেশি প্রয়োজন হয়। কারণ, মেয়েদের মাসিকের জন্য প্রতিমাসে যে রক্তের অপচয় ঘটে তার পরিপূরণের জন্য অর্থাৎ রক্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।
- কিশোর-কিশোরীদের দেহ ত্বকের ও চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন- এ, বি ও সি সমৃদ্ধ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিশোর-কিশোরীর গুটির চাহিদা -

- শক্তির চাহিদা - বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তি বা কিলো ক্যালরির চাহিদা বাড়ে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কিছুটা বেশি শক্তি বা কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়।
- প্রোটিন - কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের শক্তি চাহিদার ১২-১৫% প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ১০-১২ বছর বয়সের মেয়েদের প্রোটিনের চাহিদা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়।
- খাতবলবণ - কিশোর-কিশোরীদের হাড়ের বর্ধনের জন্য ক্যালসিয়ামের চাহিদা প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে বেশি হয়। হাড়ের যথাযথ বর্ধন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন অবশ্যই ১৫০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম শরীরে জমা হতে হবে। এই বয়সে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে পরবর্তী জীবনে ওস্টিওপোরোসিস দেখা দেওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি বেড়ে যায়। রক্তের হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের জন্য কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মাসিকের কারণে লৌহের অপচয় ঘটে বলে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বেশি হয়। এই বয়সে জিংকের চাহিদাও বাড়ে। এর অভাবে এই বয়সে শারীরিক স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলোও পরিণতিতে বিলম্ব হতে পারে।
- ভিটামিন- শক্তির চাহিদা বেশি হওয়ায় থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন এবং নায়াসিন-এর চাহিদা বাড়ে। এই বয়সে দ্রুত টিসু সংশ্লেষিত হওয়ার কারণে ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি১২ ও বি৬-এর চাহিদাও বাড়ে। মাসিকের কারণে কিশোরীদের ভিটামিন বি১২ চাহিদা বেশি হয়। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কিশোর-কিশোরীদের ভিটামিন ডি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই বয়সে প্রজননতন্ত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠনের জন্য ভিটামিন এ, ই ও সি এর প্রয়োজন হয়।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা, সুস্থতা এবং পড়ালেখা ও খেলাধুলার ক্ষমতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানেরই পর্যাপ্ত ক্যালরি উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থেকে কিলো ক্যালরিসহ প্রয়োজনীয় ছয়টি পুষ্টি উপাদান পেতে হলে খাদ্যের মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীর প্রতিটি গ্রুপ থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রতিদিনই কিশোর-কিশোরীদের নির্ধারিত কিলো ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন—

- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন কমপক্ষে তিন বেলা প্রধান খাবার ও দুইবার হালকা নাশতা দিতে হবে। এই বয়সে শিশুরা বেশ দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকে, স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা খেলাধুলাও করে থাকে, ফলে প্রচুর শক্তির খরচ হয়। তাই স্কুলে থাকাকালীন একবার পুষ্তিকর নাশতা দিতে হবে এবং বাসায় আরও একবার নাশতা খাবে। তাহলে অপুষ্টি জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।
- প্রতি বেলায় প্রধান খাবারে অর্ধাংশ সফল, দুপুর ও রাতের বেলায় মৌলিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালরির চাহিদা যাতে পূরণ হয় সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য ও শস্য-জাতীয় খাদ্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে।
- প্রতিদিনই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। দিনে অন্তত একবার প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ও রঙিন যেমন— হলুদ, সবুজ, লাল, বেগুনি, সাদা ইত্যাদি বর্ণের শাকসবজি ও ডাছা টক-জাতীয় ফল অবশ্যই থাকতে হবে।
- সারা দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করতে হবে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য দিনে ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিংকস, জুস, মিষ্টি-জাতীয় খাবার ও তেলে ভাজা খাবার গ্রহণে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে এই খাবারগুলোতে বেশি ক্যালরি থাকে। যারা পরিশ্রমের কাজ কম করে বা একেবারেই করে না বা খেলাধুলা করে না তারা এই খাদ্যগুলো প্রতিদিন গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। তা না হলে শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ওজনান্বিকো আক্রান্ত হবে এবং নানা ধরনের জটিল রোগের সূচনা হবে।
- এই বয়সে ফাস্টফুড এর প্রতি প্রায় বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরীরই বৌক থাকে। এই খাবারগুলো কোনো বিশেষ দিন বা উপলক্ষে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রতিদিনই যদি ফাস্টফুড গ্রহণ করে তাহলে খুব সহজেই তাদের শরীরের ওজন বেড়ে যাবে এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি দেখা দেবে।
- সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ায় এমন সব মজাদার ও পছন্দের খাবারের পরিবর্তে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পুষ্তিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী এক দিনের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো—

| বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য | এক পরিবেশন পরিমাণ | কিশোর (পরিবেশন সংখ্যা) | কিশোরী (পরিবেশন সংখ্যা) |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| শস্য ও শস্য -জাতীয় খাদ্য | আধা কাপ ভাত, একটি হুটি, এক টুকরো পাউরুটি। | ৮-৯ | ৬-৮ |
| প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য | একটি ডিম, মাঝারি এক টুকরা মাছ বা মাংস, এক কাপ মাঝারি খন রান্না ডাল, আধা কাপ রান্না করা খন ডাল, আধা কাপ রান্না মটরশুটি, ১/৩ কাপ বাদাম। | ৩-৫ | ৩-৪ |
| শাক-সবজি | এক কাপ কাঁচা সবজি সালাদ, আধা কাপ বিভিন্ন রান্না সবজি, আধা কাপ রান্না শাক, একটা আলু। | ৪-৫ | ৩-৪ |
| ফল | একটি মাঝারি কলা, পেয়ারা, আম, কমলা, আধা কাপ টুকরা ফল। | ৩-৪ | ৩-৪ |
| দুধ ও দুধ -জাতীয় খাদ্য | এক কাপ দুধ বা দই, আধা কাপ ছানা। | ২-৪ | ২-৪ |
| তেল ও ঘি | উচ্ছিন্ন তেল, ঘি, চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার। | কম ক্যালরি | কম ক্যালরি |

চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি-জাতীয় ও লবণ-জাতীয় খাবার এই বয়স থেকেই কম গ্রহণের অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। মনে রাখতে হবে বাইরের কেন্দ্র খাবারের চেয়ে ঘরে তৈরি খাবার এবং মৌসুমি শাকসবজি ও ফল বেশি পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তাই কিশোর-কিশোরীদের এই খাবারগুলো গ্রহণে সচেতন হতে হবে।

কাজ - তোমার জন্য একদিনের একটি খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি পৌষ্টিকত্বমি?

ক) গলবিল

খ) অগ্ন্যাশয়

গ) পাকস্থলি

ঘ) বৃহদন্ত্র

২। কিশোর-কিশোরীর দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য উপযোগী খাদ্য কোনটি?

ক) পনির

খ) লেন্ডু

গ) আলু

ঘ) বাদাম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাসনিমের বয়স ১২ বছর। তার মা তাকে প্রায়ই টিফিনে ছানা, পনির, কাবাব, টিকিয়া ইত্যাদি খাবারগুলো খেতে দেন।

৩। ওই খাবারগুলো থেকে তাসনিম কোন খাদ্য উপাদানটি পাবে?

- | | |
|-------------------|------------|
| ক) কার্বোহাইড্রেট | খ) ফ্যাট |
| গ) প্রোটিন | ঘ) ভিটামিন |

৪। মা তাসনিমকে উক্ত খাবারগুলো খেতে দেওয়ার কারণ –

- দেহের বৃদ্ধি সাধন করা।
- দেহের ক্ষয়পূরণ করা।
- কর্মশক্তি উৎপাদন করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শম্মা ও লিটু ভাইবোন। তারা দুজনই স্কুলে পড়ে। স্কুল ছুটির পর লিটু প্রায় প্রতিদিনই বাগার, স্যান্ডউইচ, ড্রিংকস ইত্যাদি খায়। মা লক্ষ করলেন লিটু দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে শম্মা বয়সের তুলনায় কম লম্বা হচ্ছে। এ নিয়ে চিন্তিত মা একজন পুষ্টিবিদের সাথে আলাপ করলে পুষ্টিবিদ শম্মার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং লিটুকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনে মাকে মনোযোগী হতে বললেন।

- ক. কৈশোরকালের বয়স সীমা কত?
- খ. খাদ্য পরিপাক হওয়া প্রয়োজন কেন?
- গ. শম্মার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. লিটুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য মায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১ : নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সুস্বাস্থ্যই হচ্ছে সকল সফলতা ও সুখের চাবিকাঠি। আর সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের গুরুত্ব -

বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে নগরায়ণের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সেই সাথে ঘটেছে আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন। আমরা যন্ত্র নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক জীবনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন গঠনের পথকে নিজেরাই জটিল করছি। ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছি। জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনের পরিবর্তে এসেছে অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন প্রণালি।

যখন তখন ফাস্টফুড গ্রহণ, পানির পরিবর্তে সফট ড্রিংকস পান করা, ধূমপান করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা, একেক দিন একেক নিয়মে জীবন পরিচালনা করা ও নির্ধারিত কোনো রুটিন মেনে না চলা, খুব বেশি টিভি দেখা বা কম্পিউটার গেম নিজেদেরে অত্যন্ত করা, সব সময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকা, শারীরিক ব্যায়াম না করা বা পরিশ্রমের কাজ না করা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে না চলা ইত্যাদি বিষয় নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের অন্তরায়। যার প্রভাবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও ওজনান্বিত্য এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগ যেমন - ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ আমাদের দেশে ক্রমে বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা হোটেলো থেকেই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত না হয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে অভ্যস্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ ইত্যাদি রোগগুলো প্রকাশ পায়, কর্মক্ষমতা কমে যায়, বার্ষিক্য দ্রুত হয়, এ ছাড়া এ সকল রোগের দীর্ঘমেয়াদি জটিলতায় অক্লান্ত হওয়াসহ জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়। তাই এক কথায় বলা যায় যে, সুস্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নাই।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপায়-

- ১) স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা - নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবম খাদ্য গ্রহণ, খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় মেনে চলা, পরিমিত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস পরিহার করা, সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত বিধিনিষেধ মেনে চলা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য গ্রহণে সচেতন থাকা, খাদ্য সম্পর্কিত কুসংস্কারগুলো পরিহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন সম্ভব। আর এর দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শিশুকাল থেকেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ২) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা – নিয়মতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের জন্য নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরুরি। ছোটবেলা থেকেই যদি প্রত্যেকে নিজের প্রাত্যহিক কাজগুলো যেমন– নিয়মিত নিজের কাপড় কাচা, নিজের ঘর পরিষ্কার করা, আসবাব পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজগুলো নিজে করার অভ্যাস করা হয় এবং নিয়মিত খোলাধুলা করা হয় তাহলে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয় ফলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর যারা নিজেদের কাজ করতে পারেন না বা খোলাধুলা করার সুযোগ নেই তাদের অবশ্যই নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম শরীরের ওজন স্বাভাবিক রেখে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- ৩) ঘুমের সময় ও জেগে উঠার সময় মেনে চলা – প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য জরুরি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায় ও ঘুমের অনিয়ম করেন তাদের শরীরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জটিলতা দেখা দেয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুমাতে হবে। অনেক রাত করে ঘুমানো পরিহার করতে হবে। প্রতিদিন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হবে এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠার নিয়মিত অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- ৪) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা – অনিয়ন্ত্রিত ও জটিল জীবনযাপন প্রণালির কারণে বর্তমানে মানসিক চাপ বেড়ে গেছে। যা সুস্বাস্থ্যের অন্তরায় এবং উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত। মানসিক চাপ কমানোর জন্য নিয়ন্ত্রিত সহজ সরল জীবন প্রণালি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। জীবন চলার পথে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যায় অস্থির না হয়ে চিন্তাচক্রেতার সাথে তা মোকাবিলার উপায় বিবেচনা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে কাজ সম্পাদন করা, অতিরিক্ত অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারলে মানসিক চাপ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- ৫) যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে অত্যন্ত করা – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের জন্য যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে তার সাথে অত্যন্ত করা জরুরি। যেন রাখতে হবে, ছোটবেলা থেকেই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তী জীবনেও এর নেতিবাচক ফলাফল ভোগ করতে হবে। সূচী সময় পরিকল্পনা ও এর অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সহজ হয়।
- ৬) ধূমপান বর্জন করা – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের জন্য সুস্থতা প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপায়ী ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এদের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। এ ছাড়া ধূমপায়ী ব্যক্তি যখন ধূমপান করেন তখন তিনি শুধু নিজেরই ক্ষতি করেন না, তার আশপাশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরও ক্ষতি করেন। এক কথায় বলা যায় যে ধূমপায়ী ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই অবশ্যই ধূমপান বর্জন করতে হবে।
- ৭) ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলা – ছোটবেলা থেকেই পানাহারে, চলাফেরায়, মেলামেশার ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলায় অত্যন্ত হওয়া যায় যেমন– পরিমিত আহার করা, অতি ভোজন পরিহার করা, মদপান থেকে বিরত থাকা, পারস্পরিক মেলামেশায় নিরাপদ ও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলা যায় তাহলে খুব সহজেই নিয়মতান্ত্রিক সুস্থ জীবনযাপন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৮) নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও মেনে চলা – সহজ করে জীবন পরিচালনার জন্য ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও তা মেনে চলা। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন প্রনালি নিজেকে অভ্যস্ত করা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় উপরের আটটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোটবেলা থেকে নিজের মধ্যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুধাবন করে চর্চা করতে পারলে খুব সহজেই নিয়মতান্ত্রিক সুস্থ জীবন লাভ করা যায়। মনে রাখতে হবে সুস্থ ও নিরোগ জীবনযাপনের জন্য এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করার পরিণতি – নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। যেমন–

- ওজন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।
- জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়।
- কর্মক্ষমতা কমে যায়।
- বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে উপরের সমস্যাগুলো সৃষ্টির প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমরা এখন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ সম্পর্কে জানব।

কাজ – তুমি কীভাবে তোমার জীবনকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করতে পারবে তা বর্ণনা কর।

পাঠ-২ : ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস একটি বিপাক জনিত রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে বিপাকজনিত ট্র্যাটি ঘটে, ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস কোনো সঙ্কামক রোগ নয়। একবার ডায়াবেটিস হলে তা একেবারে সেরে যায় না, তবে চিকিৎসা সঙ্কান্ত নিয়ম মেনে চললে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ছাড়া কোনোভাবেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। যে কেউ যে কোনো বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে তবে নিম্নলিখিত কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় –

- বংশগত কারণ– যাদের মা-বাবা ও খুব নিকটজনের ডায়াবেটিস আছে, তাদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন
- শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা
- অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় – ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। তবে এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি নিয়ম মানতে হয়–

- খাদ্য ব্যবস্থা
- শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম
- ঔষধ
- রোগ সম্পর্কে শিক্ষা

উদ্ভিগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। তাহলে সহজেই ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

(ক) ডায়াবেটিসে খাদ্য ব্যবস্থাপনা – ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই গ্লুকোজ প্রধানত খাবার থেকে আসে। আর তাই ডায়াবেটিস হলে খাদ্য গ্রহণে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। ডায়াবেটিস হওয়ার আগে ও পরে পুষ্টি চাহিদার কোনো তারতম্য ঘটে না। কিন্তু খাদ্য গ্রহণে নিয়ম মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা ও স্বাস্থ্য ভালো রাখা।

খাদ্য গ্রহণের নিয়ম –

- বেশি খাওয়া যাবে বা ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে – যে খাবারগুলোতে প্রচুর আঁশ আছে সেই খাবারগুলো বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না, তাই সেইগুলো বেশি করে খাওয়া যাবে। সব রকমের শাকসবজি যেমন– চিচিঙ্গা, ধন্দুল, পেঁপে, পটোল, শিম, লাউ, শসা, খিরা, করলা, উচ্ছে, কঁকরোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ইত্যাদি। ফলের মধ্যে জাম, জামরুল, আমলকী, লেবু, জাম্বুয়া ইত্যাদি।
- হিসাব করে খেতে হবে – কিছু খাবার আছে খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ না বাড়লেও সেই খাবারগুলো পরিমাণে বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেই খাবারগুলো হিসাব করে খেতে হবে। যেমন– ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, ঝৈ, কিস্কুট, আলু, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়া, দুধ, ছানা, পনির, মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, মিষ্টি ফল যেমন– কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী। এগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দ্রুত বাড়ায় না।
- পরিহার করতে হবে – কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ার পর খুব দ্রুত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেই খাবারগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন– চিনি, গুড়, মিসরি, রস, সরবত, সফট ড্রিংকস, জুস, সব রকমের মিষ্টি, পায়স, ক্ষীর, পেস্টি, কেক ইত্যাদি।
- শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। আবার শরীরের ওজন কম থাকলে তা বাড়িয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। সব সময় শরীরের ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খেতে হবে। নিজের ইচ্ছামতো কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। এক বেলায় বেশি খাওয়া বা অন্য বেলায় কম খাবার খাওয়া অথবা এক দিন কম এক দিন বেশি খাবার খাওয়া যাবে না।

এক কথায় কলা যায় যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে খাদ্য গ্রহণে সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(খ) শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ও নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

(গ) ওষুধ – সঙ্গত ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তবে কোনো কোনো ডায়াবেটিস রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলার পাশাপাশি খাবার বাড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। যে রোগীকে চিকিৎসার জন্যে ওষুধ অর্থাৎ খাবার বাড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন যা–ই দেওয়া হোক না কেন

তাকে তার জন্য নির্ধারিত ডোজ ও এর সাথে খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের সঠিক নিয়ম খুবই সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে। তা না হলে ঔষধ রোগ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জীবনের ঝুঁকির কারণও হতে পারে।

(ঘ) রোগ সম্পর্কে শিক্ষা – ডায়াবেটিস সারা জীবনের রোগ তাই এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রোগীকে ও রোগীর নিকট আত্মীয়দেরও অবশ্যই রোগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। কারণ ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা মেনে চলা – ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন অর্থাৎ জীবনযাপনে শৃঙ্খলা মেনে চলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাপনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে–

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুখম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সঙ্ক্রান্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলা • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন গ্রহণ করা • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা • পারের নিয়মিত বিশেষ যত্ন নেওয়া | <ul style="list-style-type: none"> • ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা কখন না করা • নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট সংরক্ষণ করা • হুমপান ও মদপান পরিহার করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট হুটিন মেনে চলা • ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা • শারীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা |
|---|--|

কাছ – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পাঠ-৩ : হৃদরোগ

আমাদের দেশে দিন দিনই হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হৃদরোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে – অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, অতিরিক্ত সমৃদ্ধ চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্যশক্তি গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করা, বংশগত কারণ, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে–

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • নিয়মিত সুখম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সঙ্ক্রান্ত বিধি নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা • নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা | <ul style="list-style-type: none"> • নির্দিষ্ট সময় ঘুমতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠা। • ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো • মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা • হুমপান ও মদপান পরিহার করা • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট হুটিন মেনে চলা • শারীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা |
|--|--|

হৃদরোগে খাদ্য ব্যবস্থাপনা –

হৃদরোগীর খাদ্য এমন হতে হবে যাতে করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শক্তির চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহীত না হয় ও খাদ্য সুখম হয়। খাদ্যের মাধ্যমে তিনি, লবণ ও ফ্যাটের গ্রহণ যেন কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আঁশ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

- লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার রুটি খাওয়ায় অভ্যাস্ত হতে হবে এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন- শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টক জাতীয় ফল যেমন- লেবু, জাম্বুড়া, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন রঙিন সবজি যেমন- সবুজ (শাক পাতা), কমলা (মিষ্টি কুমড়া / গাজর), বেগুনি (বিট), লাল (টমেটো), হলকা হলুদ-সাদা (মুলা, শসা) প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে। মৌসুমি তাজা শাকসবজি প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ডাল, বাদাম পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।
- ননী তেঁতা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া ভালো।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।

যে খাবারগুলো বাদ দেওয়া উচিত-

- মাখন, ঘি, ভালভা, ক্রিম সস, নারকেল, বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- আইসক্রিম, মিষ্টি-জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।
- বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, হাঁস-মুরগির চামড়া ও এদের তৈরি খাদ্য।
- বেশি লবণযুক্ত বা লবণে সঞ্চারিত যে কোনো খাবার, যেমন- পনির, আচার-চাটনি, সস, সয়া-সস, চিপস, চানাচুর, লবণযুক্ত বাদাম, নোনা ইশলি, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- ফাস্টফুড যেমন- চিকেন ফ্রাই, পিচ্ছা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন- বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে।
- চাইনিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

কাঙ্ক্ষ – হৃদরোগীর জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করার সময় খাদ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?— একটি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ-৪ : উচ্চরক্তচাপ

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, বংশগত কারণ, ওজনাধিক্য, বিপাকীয় ত্রুটি ইত্যাদি কারণে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। ওষধের পাশাপাশি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওজন

সামান্যিক রাখা এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করাই উচ্চরক্তচাপ চিকিৎসার অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায়।

উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • নিয়মিত সুস্থ খাদ্য গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধি নিষেধগুলো মেনে চলা • নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা • নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা • নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা • মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা | <ul style="list-style-type: none"> • নির্দিষ্ট সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠা। • ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো • ধূমপান ও মদপান পরিহার করা • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসহজ জীবন যাপন করা • প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা • শারীরিক যে কোনো জ্বরুরি অবস্থায় বা রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত হলে বা রক্তচাপ উঠানামা করলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা। |
|---|--|

উচ্চরক্তচাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন— শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন— লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- কচি ডাবের পানি উপকারী।
- ভাত ও রুটি এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না। সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও গমের ভুসিসহ আটার রুটি বেশি উপকারী।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- ডাল, বাদাম খাওয়া যাবে।
- ননী তেলো দুধ ও এই দুধের তৈরি টকদই খাওয়া।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।
- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত—

- বেশি লবণযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। যেমন— পনির, আচার-চাটনি, সস, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি।
- লবণে সজ্জ্বিত যে কোনো খাবার, যেমন— নোনা ইলিশ, তিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- মাখন, ঘি, ভালতা, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- চর্বিযুক্ত মাংস ও এর তৈরি খাদ্য।
- ফাস্টফুড যেমন— চিকেন স্ট্রাই, পিজ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।

- বেকারির খাবার যেমন- বিস্কুট, পেস্টি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে এবং সয়াসস, চাইনিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি নষ্ট হওয়া, স্ট্রোক হওয়া ও হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

কাছ – উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রতিদিন কতো ঘণ্টা ঘুমাতে হয়?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) ৩-৪ ঘণ্টা | খ) ৪-৫ ঘণ্টা |
| গ) ৬-৮ ঘণ্টা | ঘ) ৯-১০ ঘণ্টা |

২। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি কেন?

- | | |
|---|--|
| ক) এতে আশপাশে বরা থাকেন, কেউ কিছু মনে করে না। | খ) জীবনে চলার গর্বে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। |
| গ) নানা রকম সমস্যা মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না। | ঘ) উচ্চরক্তচাপ সহ বিভিন্ন মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস ঝর্ণার বয়স ৫০ বছর। চার্বিযুক্ত মাছ, মাংস, কুসুমসহ ডিম খাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাস। কয়েক দিন ধরে সে নানা রকম অসুবিধা বোধ করছে। তাই মিসেস ঝর্ণার মেয়ে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

৩। মিসেস ঝর্ণার কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত?

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ক) সাদা আটার রুটি ও সাদা চালের ভাত | খ) পনির ও মাংসের কাবাব |
| গ) ননীতোলা দুধ ও টকদই | ঘ) কেক ও মিষ্টি দই |

৪। মিসেস ঝর্ণার এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির কারণ—

- i. স্নেহের আধিক্য
- ii. প্রোটিনের আধিক্য
- iii. কার্বোহাইড্রেটের আধিক্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

১। মিসেস শীলার বয়স ৪৫ বছর। তার সন্সারের রান্নার কাজ, কাপড় ধোয়ার কাজ, ঘরের কাজের জন্য দুজন গৃহকর্মী রয়েছে। তিনি প্রতিদিন দেহেতে ঘুম থেকে উঠেন। সকালে পরটা, মাংস, মিষ্টি, ডিম দিয়ে নান্দতা করেন। তারপর খবরের কাগজ ও টি.ভি নিয়ে বসেন। দুপুরে গোসল করে খেয়ে দেয়ে ২ ঘণ্টা ঘুমান। দুই বেলোতেই মাছ, মাংস ছাড়া ভাত খান না। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি টি.ভি দেখে রাতের খাবার খেয়েই শূয়ে পড়েন। কিছুদিন পর তার দেহের ওজন অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ক. সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি কী ?

খ. নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

গ. মিসেস শীলার সঠিক খাদ্যাভ্যাস কীভাবে হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস শীলার জীবন প্রণালি সংশোধন না করলে তার শারীরিক জটিলতা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়—কথাটির সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর।

২। মাসুমা বেগম মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। তার দেহের ওজনও বেশি। অসুস্থ বাবা-মার দেখাশোনা, দুইবেলা তাদের ইনসুলিন দেওয়া ও খাবারের ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। সন্সারের ব্যবসায়ী কাজ করতে গিয়ে তিনি কোনো চলাফেরার কোনো নিয়মশৃঙ্খলা মানেন না। তিনি মিষ্টি, পায়ের, সফট ড্রিকস, জুস খেতে পছন্দ করেন। মাসুমার শরীর খারাপ হলে চিকিৎসক তাকে ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন।

ক. বিপাকজনিত একটি রোগের নাম লেখ ?

খ. ঔষধমুক্ত খাবার গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. মিসেস মাসুমাকে তাঁর বাবার জন্য কোন ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস মাসুমার সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবন প্রণালি—বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায় খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

পরিবারের সবার দৈনিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করা হয়। এই খাদ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হয়। প্রস্তুতকৃত খাদ্য প্রব্যাদি সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়- যাকে বলা হয় খাদ্য পরিবেশন। খাদ্যপ্রব্য সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-১ : মেনু তৈরি

খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয়। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যেসব খাদ্য খাওয়া হয় তা যেন শরীরকে কর্মক্ষম রাখে, ক্ষয়পূরণ করে ও বৃদ্ধিসাধন অব্যাহত রাখে এবং শরীরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে। এ জন্য প্রয়োজন খাদ্যের সব উপাদানসমৃদ্ধ সুখম খাদ্যের। সুখম ও পুষ্টিকর আহারই দেহের প্রতিটি অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি সরবরাহ করে দেহকে সুস্থ রাখতে পারে। এ জন্য বয়স (শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ) পরিপ্রমের ধরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হয়। এই পরিকল্পনার উপায় হলো 'মেনু তৈরি'।

প্রতিদিনের আহারে কী কী খাদ্য পরিবেশন করা হবে তার জন্য মেনু পরিকল্পনা করা উচিত। মেনু পরিকল্পনায় পরিবারের বাজেট বা আয় অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের রুচি, চাহিদা, বয়স, খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পরিবারের তিন কোণার আহার ছাড়া শিশুর পরিপূরক খাবার, রোগীর পথ্য, বিয়ে, জন্ম দিন, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি যে কোনো উপলক্ষেই খাদ্য প্রস্তুতের আগেই একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া ভালো। মেনু তৈরির মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে খাদ্যের তালিকা তৈরি করা হয়। মোটকথা মেনু পরিকল্পনা খাদ্যের একটি তালিকা বিশেষ। অর্থাৎ যে কোনো খাদ্য ব্যবস্থায় কী খাবার পরিবেশন করা হবে তা স্থির করে যে লিখিত খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয় তাকেই মেনু বলে। মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমে সুখম, আকর্ষণীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা যায়।

মেনু তৈরির বিবেচ্য বিষয়

মেনু তৈরির মাধ্যমে যাতে পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থা সুখম হয় সে জন্য কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। সেগুলো নিম্নরূপ-

- ❖ **বয়স :** একটা পরিবারে বিভিন্ন বয়সের লোক থাকে। বিভিন্ন বয়সের লোকদের খাদ্যের চাহিদার ভিন্নতার বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন। যেমন : শিশুর সঠিক বৃদ্ধির জন্য দুধ-জাতীয় খাবারের প্রাধান্য দিতে হয়। বৃদ্ধ ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য দরকার। পরিবারের গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের জন্য স্বাভাবিক মায়ের তুলনায় বেশি ক্যালরি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- ❖ **শ্রম :** পরিপ্রমের ধরন ক্যালরির চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাই মেনু তৈরির সময় পরিবারের সদস্যদের পরিপ্রমের মাত্রা যাচাই করে পর্যাপ্ত ক্যালরিবহুল খাদ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেমন: বিশেষ করে যারা কঠিন পরিপ্রমের কাজ করে তাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও গ্লুকোজ বেশি থাকা ভালো। অপর দিকে হাল্কা পরিপ্রমী বা যারা মানসিক শ্রম করে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি খাদ্যের শারীরিক পরিপ্রম কম তাদের জন্য কম কার্বোহাইড্রেট ও গ্লুকোজ প্রয়োজন।

- ❖ **আয়—** মেনুতে পুষ্টিকর খাদ্য সংযোজনের বিষয়টি একটা বাজেটের উপর নির্ভর করে। আয় সীমার মধ্যে থেকেই পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ মাসব্যাপী পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দিতে হয়। সুখম খাদ্যের উপাদান অল্প মূল্যের খাদ্য থেকে সংগ্রহ করে স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত। খাদ্যের মূল্য কমানোর জন্য সুখম খাদ্যের উপাদানসমূহ বাদ দেওয়া চলবে না। তাই দামি খাবারের পাশাপাশি তুলনামূলক সমতা অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ❖ **আবহাওয়া ও মৌসুম—** আমাদের দেশে ঋতু ভেদে বিভিন্ন ফলমূল, তরিতরকারির সমাগম ঘটে। এগুলো পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং সহজলভ্য হয়ে থাকে। খাদ্য তালিকায় মৌসুমি খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করলে স্বাদেও বৈচিত্র্য আসে এবং মূল্য সাশ্রয়কারী খাদ্য তালিকাও বানানো যায়।
- ❖ **সিঁজা—** ছেলে-মেয়েভেদে খাদ্যের চাহিদা ভিন্ন হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দেহের আয়তন, ওজন ও শেয়ার পরিমাণ কম। এ জন্য মেয়েদের ক্যালরি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও অপেক্ষাকৃত কম হয়।
- ❖ **উপলব্ধ—** পরিবারের সদস্যসংখ্যা, আর্থিক সজ্জাতি, রুচি ইত্যাদি বিবেচনা করে দৈনিক খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়। তবে ছোট বা বড় যে কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেনু একটি আকর্ষণের বিষয়। কেননা এতে সাধারণ খাবারের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। যেমন, বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ঈদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেনু তৈরিতে ব্যতিক্রম থাকে।
- ❖ **বৈচিত্র্য সৃষ্টি—** মেনুতে নানা রং, নানা আকার, নানা প্রকৃতি এবং নানা পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার দিয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করা যায়। মেনুতে সব খাবারই যদি সাদা বা একই রঙের হয় তাহলে দেখতে আকর্ষণীয় হয় না। তেমনি সব খাবারই যদি নরম ও শুকনা হয় তাহলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। বিভিন্ন রঙের খাবার— যেমন, টমেটো, গাজর, কলা, মটরশুঁটি, দুধ, দই, ভাত, জর্দা ইত্যাদি। বিভিন্ন আকারের খাবার— যেমন, সিঁজারা, স্যান্ডউইচ, পাউরুটি, কেক, নিমকি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকৃতির খাবার— যেমন, সুপ, ফীর, হাঙ্গুয়া, কাস্টার্ড, পুডিং, পাপড়, চিপস ইত্যাদি।
- ❖ **এক পরিবেশন পরিমাণ—** মেনুতে তালিকাতুল্য খাবারগুলো কতোজন লোক গ্রহণ করবে তার উপর খাবারের মোট পরিমাণ নির্ভর করে। মেনুতে যেসব খাদ্য রাখা হয় তার প্রতিটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত এক পরিবেশন পরিমাণ বরাদ্দ করতে হয়। যেমন, রান্না করা শাক এক পরিবেশন = ১/৩ কাপ।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

| | |
|----------|---------|
| টটকা দুধ | ১ কাপ |
| দই | ১/২ কাপ |
| আইসক্রিম | ১/২ কাপ |
| রসগোল্লা | ১ টা |

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

| | |
|-----------------|----------|
| কাঁটা ছাড়া মাছ | ৩০ গ্রাম |
| হাড় ছাড়া মাংস | ৩০ গ্রাম |

| | |
|-----|----------|
| ভিম | ১ টা |
| ডাল | ২৫ গ্রাম |

শাক-সবজি, ফল এক পরিবেশন পরিমাণ—

| | |
|-----------------|---------|
| রান্না করা শাক | ১/৩ কাপ |
| রান্না করা সবজি | ১/২ কাপ |
| সলাদ | ১/২ কাপ |
| ফল মাঝারি আকার | ১টি |

শস্য জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

| | |
|-----------|-----------|
| ভাত | ১ কাপ |
| আটার রুটি | ২টি |
| পাউরুটি | ২ টুকরা |
| আলু | ১৮০ গ্রাম |

এ ছাড়া মেনু তৈরি করার সময় পরিবেশনের ধরন, সঠিক রেসিপি ব্যবহার, তৈজসপত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির সুবিধা, দক্ষ রন্ধনকারী, উদ্বৃত্ত খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

নমুনা : একটি পরিবারের এক দিনের মেনু।

পরিবেশন সংখ্যা ০৫

| সময় | স্বল্প মূল্যের খাবার | দামি খাবার |
|---------------|---|--|
| সকালের নাশতা | আটার রুটি, সবজি ভাজি, কলা, চা | পরোটা, ভিম ভাজা, আপেল, কফি |
| দুপুরের খাবার | সাধারণ চালের ভাত, ডাল, শাক, ছোট মাছ, লেবু, কাঁচা মরিচ | ডিকন চালের ভাত, বড় মাছের তরকারি, সলাদ |
| বিকাল | মুড়ি মাখা, চা | ফলের রস/কফি, কেক |
| রাতের খাবার | ভাত, ডিমের তরকারি, ডাল, আলু তর্তা | ভাত, মুরগির ঝোল, আলুর চপ, সলাদ |

পাঠ-২ : রেসিপি প্রয়োজনীয়তা

সুস্থ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মেনু অর্থাৎ খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়। এই খাদ্য তালিকায় খাদ্যগুলো তখনই মুখরোচক, আকর্ষণীয় ও ভুক্ষিতীয়ক হয়ে উঠে যখন তা সঠিক পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। রান্নার কাজটা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও প্রায়ই সেখা যায় কোনো না কোনো ত্রুটি থেকে যায়। একই খাবার একবার মানসম্মত ও সুস্বাদু হলেও পরবর্তী সময় আবার সে রকম মজাদার নাও হতে পারে। কিন্তু একই পদ্ধতিতে এবং পরিমাণমতো উপকরণ দিয়ে রান্না করলে প্রতিবারই রান্না করার বস্তুই মান একই রকম রাখা যায়। এ কারণেই তৈরি হয়েছে রেসিপি। রেসিপি এমন একটা নির্দেশক যা কীভাবে এবং কী কী উপকরণ কী পরিমাণ

ব্যবহার করে রান্না করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। সুতরাং রেসিপি বলতে বোঝায় রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের তালিকা, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতির লিখিত পথ নির্দেশ বিশেষ।

রান্নাকরা প্রতিটি খাদ্যেরই নিজস্ব উপকরণ, পরিমাণ ও রন্ধন পদ্ধতি থাকে। যেমন, পুড়িয়ে, আলুর চপ, কাবাব ইত্যাদি।

| রেসিপিতে রান্নার সময় সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো দেওয়া হয় সেগুলো হলো— | |
|--|---|
| • খাবারের নাম | • ব্যবহৃত উপকরণের নাম |
| • উপকরণের পরিমাণ | • রান্নায় ব্যবহৃত মাংস কিংবা তরকারির কাটার ধরন |
| • রান্নার ধারাবাহিক ধাপসমূহ | • রান্নায় ব্যবহৃত তাপমাত্রা |
| • সময় | • পরিবেশন সংখ্যা |
| • পরিবেশনের ধরন | |

রেসিপি কী কাজে লাগে—

- রেসিপি থেকে খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো মেপে নেওয়া হয় ফলে কোনো জিনিসের অপচয় হয় না।
- আদর্শ রেসিপিতে পরিবেশন সংখ্যা উল্লেখ থাকে। ফলে কতোজন লোক খেতে পারবে তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং পরিবেশনের কাজটি সহজ হয়।
- রেসিপি অনুসরণ করে যে কোনো নতুন রান্না আয়ত্তে আনা যায়। মেনুর সাথে রেসিপি নির্দেশনা থাকলে দক্ষ পাচক অতি সহজেই তা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।
- পাচকদের নিকট রেসিপি থাকলে রান্না করা খাবারের মান ও পরিমাণ যাচাই করতে সুবিধা হয়।

রেসিপি ব্যবহার করার সময় লক্ষণীয় বিষয়—

- রেসিপি সঠিকভাবে বুঝে অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপিতে উল্লিখিত পরিমাণমতো উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- কোনো উপকরণ বাদ দেওয়া ঠিক নয়।
- রেসিপিতে লেখা কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- যে অবশ্যই (গরম, ঠাণ্ডা, তরল, কঠিন) খাবার পরিবেশন করার কথা উল্লেখ থাকবে সেইভাবেই করতে হবে।
- রেসিপিতে নির্দেশিত রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপি বুঝতে হলে খাদ্যের মাপ, ওজন, রান্নার সরঞ্জাম, রান্নার কৌশল ও পদ্ধতি, উপকরণ ও মসলা এবং বিনিময় বা বিকল্প খাদ্য সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

কাজ : খাদ্য প্রস্তুতকরণে রেসিপি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৩ – খাদ্য প্রস্তুত

মেনু তৈরি করার পর খাদ্য প্রস্তুত করার প্রস্তুতি নিতে হয়। খাদ্য প্রস্তুতকরণের পূর্বে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়—

- কী খাদ্য প্রস্তুত করা হবে তা মেনু অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।
- যে যে খাদ্য প্রস্তুত করা হবে সেই খাদ্য তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুত করার আগে সঠিক রেসিপি জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া যায়।
- কাঁচা মাছ—মাংস, শাকসবজি বেছে, কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেমন : খাবার ঢেকে রান্না করা, বেশি তাপে খাদ্য রান্না না করা ইত্যাদি।
- খাদ্য প্রস্তুত করার সাথে সাথে পরিবেশনের প্রস্তুতি নিতে হয়।
- খাদ্য প্রস্তুতের পর পরই খাদ্য গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

এখন আমরা গুড়িঙ ও সবজি নিরামিষ প্রস্তুত প্রণালি আলোচনা করব।

রেসিপি নমুনা—

নমুনা – ১ গুড়িঙ

| উপকরণ | পরিমাণ | প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা) |
|---------------|----------------|---|
| ডিম | ৩ টি | ৫০০ গ্রাম প্রায় ৪ পরিবেশন |
| দুধ | ৫০০ গ্রাম (ঘন) | |
| চিনি | ৩ টেবিল চামচ | |
| ভেনিলা এসেন্স | ৪ ফেঁটা | |

প্রস্তুত প্রণালি :

- গুড়িঙ তৈরি করার পায়ে চিনি ক্যারামেল (উনুনের উপরে বেশি তাপে চিনি গলিয়ে বাদামি রং করা) করে নিতে হবে।
- অপর একটি পায়ে ডিমগুলো ভালোভাবে ফেঁটাতে হবে। ফেঁটানো ডিমের সাথে দুধ চিনি মেশাতে হবে।
- গুড়িঙ তৈরির পাত্রটি ঠান্ডা করে তাতে উক্ত মিশ্রণটি (ডিম—দুধ—চিনির) ঢালতে হবে।

- বড় সসপ্যানে হুটানো পানি দিয়ে দুধ-ভিন্ন মেশানো পাত্রটি মুখ বন্ধ করে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে পাত্রটির ১/৩ অংশ পানিতে ডুবে থাকে।
- চুশার আঁচ মাঝামাঝি করে ১ ঘণ্টা হুটাতে হবে।
- পুডিং সম্পূর্ণরূপে জমে গেলে ঠান্ডা করে নিতে হবে।
- ঠান্ডা হলে ছুরি দিয়ে পুডিং-এর চারদিক ছাড়াতে হবে। প্রেটে তৈরি করা পুডিং-এর পাত্রটি উল্টে পুডিং ঢেলে নিতে হবে।

পরিবেশন সংখ্যা- প্রস্তুতকৃত পুডিংয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০০ গ্রাম। দুগ্ধজাত খাদ্য পুডিংয়ের এক পরিবেশন পরিমাণ = ১/২ কাপ বা ১২৫ গ্রাম। এর ফলে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিবেশন সংখ্যা ৪ অর্থাৎ ৪ জন খেতে পারবে।

রেসিপি নমুনা-২

খাদ্যের নাম- সবজি নিরামিষ

| উপকরণ | পরিমাণ | প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা) |
|---------------|-------------|---|
| মিষ্টি কুমড়া | ২০০ গ্রাম | ১ কেজি |
| বেগুন | ১০০ গ্রাম | ১০ পরিবেশন |
| পটোল | ২০০ গ্রাম | |
| পেঁপে | ২০০ গ্রাম | |
| আলু | ৩০০ গ্রাম | |
| আদা বাটা | ১ চা চামচ | |
| রসুন কাটা | ১/২ চা চামচ | |
| হলুদের গুঁড়া | ১/২ চা চামচ | |
| মরিচের গুঁড়া | ১/২ চা চামচ | |
| ধনের গুঁড়া | ১ চা চামচ | |
| জিরার গুঁড়া | ১/২ চা চামচ | |
| পেঁয়াজ কুচি | ১/২ কাপ | |
| লবণ | ২ চা চামচ | |
| চিনি | পরিমাণমতো | |
| কাঁচা মরিচ | ১/৪ চা চামচ | |
| তেজপাতা | ২টি | |
| তেল | ১০০ গ্রাম | |
| পাঁচ ফোড়ন | পরিমাণ মতো | |

প্রস্তুত প্রণালি :

- সবধরনের সবজিগুলো কাটার আগে ভালো করে ধুতে হবে।
- সবজিগুলো পছন্দমতো টুকরা করে কেটে নিতে হবে।
- গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি, বাটা ও গুড়া মসলাগুলো কথিয়ে নিয়ে হবে।
- বেগুন ও মিষ্টি কুমড়া ছাড়া বাকি সব সবজি লবণ দিয়ে নেড়ে নিতে হয় ৩-৪ মিনিট পর ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- পানি ফুটলে বেগুন, মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ভালো করে ঢেকে মৃদু ছাশে রাখতে হবে।
- ১০-১৫ মিনিট পর সবজি সিদ্ধ হলে কাঁচা মরিচ, চিনি ও টালা পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছড়িয়ে দিতে হবে।
- সবজির পানি শুকিয়ে তেল ওপরে উঠলে চুলা থেকে নামাতে হবে।

পরিবেশনের সংখ্যা— এই রেসিপিতে রান্না করা সবজির পরিমাণ ১ কেজি। রান্না করা সবজির ১ পরিবেশন = ১/২ কাপ। এটা দশজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকে অন্তত ১ পরিবেশন পরিমাণ পাচ্ছে— যা একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা মেটায়।

পাঠ-৪ : খাদ্য পরিবেশন

খাদ্য যথাযথভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের সম্পূর্ণ ভূমিকা ও আনন্দ লাভ করা যায়। খাদ্য পরিবেশন হচ্ছে একটা কৌশলগত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়।

যে পদ্ধতিতে মেনু অনুযায়ী প্রস্তুত খাদ্য প্রব্যাটি কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয় তাকে খাদ্য পরিবেশন বলে।

সুন্দর পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। বাড়িতে, বাইরে কিংবা বিভিন্ন উৎসবে খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা সুন্দর ও সুষ্ঠু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশনের সাথে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কযুক্ত। জাতিগত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় বিবেচনা করা দরকার।

টেবিল সাজানো

সাধারণত খাবার যখন টেবিলে সাজানো হয় সেটাই পরিবেশন। খাবার আগে টেবিল গোছানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ার কাজটি সহজ ও আনন্দময় করা। খাবার টেবিলে খাদ্য গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র সুসজ্জিত থাকলে তা আহারে ভূমিকা বাড়ায়।

টেবিল সাজানোর ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ—

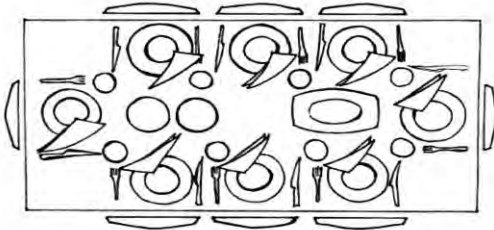
- টেবিলে কাপড় বিছানো ও ম্যাট সাজানো।
- সজ্জামূলক সামগ্রী দিয়ে সাজানো ঘেমন, খাবার টেবিলের উপযোগী পুষ্টিবিন্যাস করা, খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করা।

- খাবারের পাত্র সাজাতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া কিংবা আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা ও রীতি অনুযায়ী সাজাতে হয়।
- বাদ্য গ্রহণের টেবিল বা স্থানটি সুবিন্যস্ত এবং শান্ত ও মনোরম পরিবেশে হওয়া দরকার। এ জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত পরিবেশ।

আনুষ্ঠানিক পরিবেশন

কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয় তাকেই আনুষ্ঠানিক ভোজ বলে। এ ধরনের ব্যাপক আয়োজন সাধারণত : রাষ্ট্রীয় ভোজ, সামাজিক আচার-আচরণ, বাৎসরিক গ্রীতিভোজ, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ ছাড়া হোটেল, রেস্টোরাঁর খাবার পরিবেশনও আনুষ্ঠানিক বাক্যপনা। আনুষ্ঠানিক ভোজের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

- আনুষ্ঠানিক ভোজে পদমবীনা অনুযায়ী চেয়ার, টেবিল সাজানো হয়ে থাকে।



আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে বাদ্য পরিবেশন

- আনুষ্ঠানিক ভোজের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রত্যেক অতিথির জন্য এককভাবে প্রতিটি খাবারের পরিবেশনের জন্য একক মোট পরিমাণ (unit) সাজানো থাকে অথবা পরিবেশনকারী পর্যায়ক্রমে পরিবেশন করে থাকে।
- সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভোজে প্রধান অতিথির টেবিলের বিপরীত দিকে নিমন্ত্রণকারী বা হোস্ট/হোস্টেস বসার রীতি।
- আনুষ্ঠানিক ভোজে একই সাথে সব বাদ্য টেবিলে সাজানো থাকে না। বরং পরিবেশনকারী প্রধান বাদ্য থেকে শুরু করে খাবার শেষে বিভিন্ন ডেসার্ট (কলমুল/মিষ্টি/পানীয় ইত্যাদি) পরিবেশন পর্যন্ত সব বাদ্যই পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করে থাকে।
- আনুষ্ঠানিক ভোজকে আকর্ষণীয় করার জন্য পরিবেশন টেবিলের কেন্দ্রীয় সজ্জায় আলো ও পুষ্পসজ্জা করা হয়।

- যদি পরিবেশনকারী ডান দিক থেকে পরিবেশন শুরু করে তবে সে তার ডান হাত দিয়েই প্রেট, গ্রাস অথবা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, খাবার এবং খাবার সিলে এবং ডান হাত দিয়ে খাওয়া শেষে সরিয়ে নেবে আবার বাম দিক থেকে পরিবেশন করতে হলে পরিবেশনকারীকে বাম দিকে দাঁড়িয়ে বাম হাত দিয়ে সবকিছু সরিয়ে নিতে হবে এবং দিতেও হবে।

পাঠ ৫ – বু-ফে পরিবেশন

অতিথির সংখ্যা বেশি হলে, জায়গা কম থাকলে এবং বিশেষ বা প্রধান অতিথি না থাকলে বু-ফের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে উৎসবগুণোৎসব জনানুষ্ঠানিক হয়ে থাকে। যেমন, জন্মদিন, আকিকা, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি।

বু-ফে পরিবেশনের রীতি—

- বিভিন্ন জায়গায়, বাসার লনে বা লম্বা বারান্দায় অথবা খোলা বাগানে, হলরুমে ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি টেবিলে একই ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয়।
- খাবার গ্রহণের প্রেট, গ্রাস, চামচ, কাপ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি একটি টেবিলে সুন্দরভাবে রাখা হয়।
- টেবিলের দুই পাশে একইভাবে অথবা টেবিলের চারপাশে একইভাবে খাবারগুলো সাজালে যে কোনো পাশ থেকে অতিথিরা প্রত্যেক প্রকার খাবার প্রেটে নিরে স্বাধীনভাবে পছন্দমতো জায়গায় বসে গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে আনন্দের সাথে খাবার উপভোগ করতে পারেন।

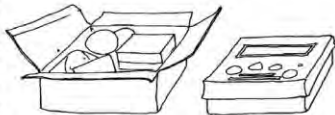


বু-ফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

কাজ – খাদ্য পরিবেশনে কোন পদ্ধতিটিকে জুমি যুগোপযোগী মনে কর এবং কেন?

পাঠ-৬ : প্যাকেট পরিবেশন

বিভিন্ন খাবারকে মোড়কজাত করে পরিবেশন করাকে প্যাকেট পরিবেশন বলা হয়। সময়ের স্বল্পতা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাড়তি বামেলা এড়ানো ইত্যাদি কারণে আজকাল প্যাকেট পরিবেশনের কদর বেড়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন, মিলাদ,



প্যাকেট পরিবেশনের নমুনা

সেমিনার, ইকতার পার্টি কিংবা স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে প্যাকেট পরিবেশনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

প্যাকেট পরিবেশনে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা সুবম, আকর্ষণীয়, রুচিকর এবং বহনে সুবিধা করার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন,

- মোড়কজাত খাবার শুকনা ও হালকা হলে পরিবেশন করতে সুবিধা হয়।
- মোড়কজাত খাবারের মেনু তৈরি করার সময় খাদ্যের চারটি মৌলিক বিভাগ থেকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।
- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের সমন্বয় করা হলে মোড়কজাত খাবারের পুষ্টিমূল্য বাড়ে।
- একচেয়েমি দূর করার জন্য মৌসুমি ফল, মুড়কি, পিঠা প্রভৃতি দেওয়া যায়।
- খাবারের ঘনত্ব এমন হওয়া উচিত যাতে প্যাকেট ভিজে না যায়।
- স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যখন প্যাকেটে লাঞ্চ পরিবেশন করা হয় তখন তা পুষ্টিকর ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত এবং ক্যালরি ও প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা $1/3 - 1/8$ অংশ এই লাঞ্চ দ্বারা পূরণ করা উচিত।
- প্যাকেট পরিবেশনের উপযোগী মেনু যেমন,

- সিঙারা/সমুচা, লাড্ডু/সম্পেশ, পনির, আপেল/কলা।
- ডালপুри, কাবাব, সম্পেশ, সালাদ।
- স্যান্ডউইচ, সালাদ (শসা, গাজর), যে কোনো শুকনা মিষ্টি।
- সবজি পাকোরা, মিষ্টি, কলা।

কাঙ্ক্ষ : প্যাকেট পরিবেশনের মেনু তৈরি কর এবং মূল্যায়ন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আদর্শ রেসিপিতে কোনটি উল্লেখ থাকে?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক) খাবারের নাম | খ) পরিবেশন সংখ্যা |
| গ) উপকরণ | ঘ) রন্ধন পদ্ধতি |

২। রেসিপি অনুসারে খাবার রান্না করলে—

- i. খাবারে নতুনত্ব আনা যায়
- ii. উপকরণ বাদ পড়ে যায়
- iii খাবারে পরিবেশন সংখ্যা ঠিক থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের ছক অনুযায়ী ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

| উপকরণ | পরিমাণ | পরিবেশন সংখ্যা |
|---------------|---------|----------------|
| ভিটম | ৬ টা | |
| দুধ | ১ কেজি | |
| ভেনিলা এসেন্স | ৮ ফেঁটা | |

৩। উপরোক্ত পুডিং কতো পরিবেশন হতে পারে।

- ক) ৪
- খ) ৬
- গ) ৮
- ঘ) ১০

৪। উপরোক্ত পুডিং দ্বারা ৫ জনকে আপ্যায়ন করা হলে—

- i অর্থের অপচয় হতে পারে।
- ii খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে।
- iii পরিবেশনে সমস্যা হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। মেয়ের জন্মদিনে রাবেয়া বেগম তার ছোট বাসায় অনেককে আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজ হাতে রান্না করা থেকে শুরু করে টেবিলে খাবার সাজানো সব একাই করেন। খাবার পরিবেশনের পূর্বস্মৃতিতে তিনি দেখলেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম করা হয় নি। খাবার পরিবেশনের সময় একসাথে সবাইকে বসাতে না পেরে তিনি বিব্রতবোধ করলেন।

ক. রেসিপি কী?

খ. খাদ্য পরিবেশন করতে কী বোঝায়?

গ. একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম বাদ পড়ার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. খাবার পরিবেশনের বৈচিত্র্যতাই পারত তার বিব্রতবোধ অবস্থা রোধ করতে— বিশ্লেষণ কর।

২। মালা মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী। দুই সন্তান স্কুলে পড়ে, স্বামী ও বৃন্দ মা-বাবা নিয়ে তার পরিবার। তার বাচ্চাদের মাংস-জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ। তাদের কারণে প্রায় দিনই মাংস রান্না করা হয়। কিছুদিন হলো তার মায়ের বুকে ব্যথা করছে। ডাক্তার তার খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে বললেন।

ক. মেনু কাকে বলে?

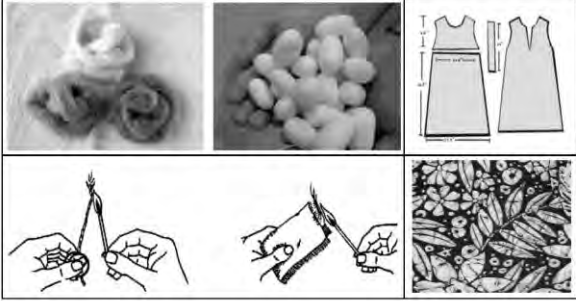
খ. খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মালার মায়ের অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মালার পরিবারে সকলের সুস্থতার জন্য সঠিক মেনু পরিকল্পনা অতি গুরুত্বপূর্ণ—তোমার মতামত দাও।

ঘ - বিভাগ

বস্ত্র ও বয়ন তত্ত্ব



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা -

- তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- তত্ত্ব শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব
- পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারব
- বর্ণচক্র বিশ্লেষণ করতে পারব
- বর্ণচক্রের মাধ্যমে দেহের ত্বক এবং শারীরিক কাঠামো অনুসারে পোশাকের রং নির্বাচন করতে পারব
- পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেখা, ভূমি এবং নকশার ক্ষেত্রে শিল্পনীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- বস্ত্রছাপার প্রকার এবং পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- ড্রাফটিংয়ের নিয়ম জেনে পোশাক প্রস্তুত করতে উৎসাহ হব
- ফটুয়া ও বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং করে সঠিক মাপে তা প্রস্তুত করে দেখাতে পারব
- বিভিন্ন নকশার বেবি ফ্রক তৈরি করে প্রদর্শন করতে পারব
- বস্ত্র ধৌতকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির বর্ণনা করতে পারব
- বিভিন্ন ধরনের পোশাক ধৌতকরণ ও সজ্জাকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- ব্যক্তিগত অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করতে পারব।

চতুর্দশ অধ্যায় বয়ন তত্ত্ব

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। সৃষ্টির আদিতে মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য কোনো বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সত্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা ও শীত-তাপ থেকে আত্মরক্ষা ছাড়াও নানাবিধ প্রয়োজনে বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। সত্যতার অগ্রগতির সাথে বৃষ্টির পরিবর্তন হওয়ায় বস্ত্র পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্যতা দেখা দিয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনে নানা রকম তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে এবং করছে। বস্ত্র তৈরি হয় মূলত সূতা থেকে, এই সূতা আবার তৈরি হয় ঐশ বা তন্তু হতে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঐশকে সূতায় পরিণত করা হয়। তবে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সব রকম ঐশ বা তন্তু বস্ত্র বয়নের উপযোগী নয়। এই বয়ন তত্ত্বের উৎস প্রকৃতি হতে পারে আবার কৃত্রিমও হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র তৈরির উপকরণ ছিল সূতি, গিলেন, রেশম ও পশম তন্তু। পরবর্তীতে রেনন, নাইলন, ডিনিয়ন, সরণ ইত্যাদি নামের অনেক কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি বয়ন তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সাধারণত ভিন্ন হয়। তাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বয়নতত্ত্ব ব্যবহার করতে হলে সেই তত্ত্বটির বৈশিষ্ট্য জানা ও শনাক্ত করা প্রয়োজন হয়।

পাঠ-১ : বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তু

সাধারণত বস্ত্র তৈরি হয় সূতা থেকে। তাই সূতাকে বস্ত্রের ক্ষুদ্রতম মৌলিক একক বলে মনে করা হতো। কিন্তু এ ধরনের সূতা আবার কতগুলো ঐশ বা তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। তন্তু বলতে যে কোনো প্রকার ঐশ বোঝালেও বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বয়ন তন্তুকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বস্ত্র তৈরির কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তাকেই বয়ন তন্তু বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বস্ত্রের মৌলিক ক্ষুদ্রতম এককই বয়ন তন্তু। ল্যাটিন শব্দ টেক্সো (Texo) থেকে টেক্সটাইল (Textile) শব্দের উৎপত্তি। টেক্সো কথাটির অর্থ হচ্ছে- বুন করা। এ জন্য বস্ত্রের তন্তুকে বয়ন তন্তু বা টেক্সটাইল ফাইবার বলা হয়।

সাধারণত যেসব গুণ থাকলে কোনো ঐশ বা তন্তুকে বয়ন তন্তু হিসেবে গণ্য করা যায় সেসব বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে কিছু আছে মুখ্য বা প্রধান এবং কিছু রয়েছে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলি। প্রধান বা মুখ্য গুণাবলিগুলো হলো – দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত, তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি, নমনীয়তা, সমন্বপতা, আসঞ্জনপ্রবণ ইত্যাদি। অন্যদিকে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলিগুলোর মধ্যে রয়েছে- রেসিলিয়েন্সি, উজ্জ্বলতা, স্থিতিস্থাপকতা, বিশোষণ, তাপ পরিবাহিতা, সজ্জাকান ইত্যাদি। নিচে বয়ন তন্তুর গুণাবলি উল্লেখ করা হলো—

মুখ্য গুণাবলী –

- ১। দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত (Length to width ratio) - বয়ন তন্তুর ব্যাসের চেয়ে দৈর্ঘ্য অসামান্যভাবে বড় হতে হবে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক তন্তুতেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত তন্তুর ব্যাস যত সূক্ষ্ম হবে, তন্তু তত নমনীয় ও মসৃণ হবে।
- ২। তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি (Tenacity) - বয়ন তন্তুর পর্যাপ্ত শক্তি থাকতে হবে। ন্যূনতম শক্তি না থাকলে তন্তুকে সূতা বা বস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে তন্তু কতটুকু টান সহ্য করতে পারে তা দিয়েই তন্তুর শক্তি প্রকাশ করা হয়।

- ৩। **নমনীয়তা (Flexibility)** - বয়ন তন্তুর তৃতীয় মুখ্য গুণাবলি হচ্ছে নমনীয়তা। যেহেতু সুতা ও বস্ত্র তাঁজ করতে হয়, তাই বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। নমনীয়তার জন্যই বয়নতন্তু দিয়ে সুতা পাকানো যায়।
- ৪। **আসঞ্জনপ্রবণ (Cohesiveness)** - এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ছোট ছোট আঁশগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। যার ফলে তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গৌণ গুণাবলী -

- ১। **রেসিলিয়েন্সি (Resiliency)** - তন্তুকে তাঁজ করা, মোচড়ানো বা ঝুঁচকানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাকে রেসিলিয়েন্সি বলে। বস্ত্রের কুঞ্জন প্রতিরোধের জন্য তন্তুর এ গুণটি থাকা উচিত। যেসব বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা ভালো তাদের রেসিলিয়েন্সিও ভালো হয়।
- ২। **উজ্জ্বলতা (Luster)** - একটি তন্তুর নিজস্ব চাকচিক্য, মসৃণ ও দীপ্তিময় ভাবই তার উজ্জ্বলতা। উজ্জ্বলতা বয়ন তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের কারণেই একে তন্তুর রানী হিসেবে গণ্য করা হয়। আজকাল বিভিন্ন ধরনের তন্তুতে সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকচিক্য সৃষ্টি করা যায়।
- ৩। **বিশোষণ (Absorbency)** - যেসব তন্তুর আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ভালো, তাতে সহজেই রং ও ফিনিশ প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া তন্তুর বস্ত্র সহজে ধোয়া যায় এবং পরিধানের জন্য সুবিধাজনক হয়। যেসব বস্ত্রের বিশোষণ ক্ষমতা কম, তাদের ভাড়াভাড়া ধুয়ে শুকিয়ে নেয়া যায়।
- ৪। **স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)** - বয়ন তন্তুকে স্থিতিস্থাপক হতে হয় অর্থাৎ তন্তু টানলে প্রসারিত হবে এবং টান সরিয়ে নিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।
- ৫। **সমন্বপতা (Uniformity)** - সুতা তৈরিতে একই দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নমনীয়, পাক বা মোচড় দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন তন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম তন্তুর মতো সমন্বপ প্রাকৃতিক তন্তু পাওয়া সহজ নয়। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ফলে তৈরি সুতার মান ভালো হয় এবং সুতা সমান ও মসৃণ হয়।
- ৬। **তাপ পরিবাহিতা (Heat conductivity)** - তাপ পরিবাহক হিসেবে ফ্ল্যাক্স তন্তুর স্থান সবার উপরে। তুলাও ভালো তাপ পরিবাহক হওয়ায় গরমকালে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। শ্রোটিন তন্তু তাপ কুশ্রিবাহী। তাই সিল্ক ও উল শীতকালের পোশাকের জন্য উপযোগী।

কাজ - বয়ন তন্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণাবলি উল্লেখ করে দুটি চার্ট তৈরি কর।

পাঠ-২ : তন্তুর শ্রেণিবিভাগ

বহু বছর আগে থেকে বয়ন তন্তুর শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শ্রেণিবিন্যাসের ধরনও বদল হয়েছে। প্রথম দিকের শ্রেণিবিভাগ ছিল বেশ সহজ সরল। যেমন- প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ, খনিজ ইত্যাদি। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে আগের শ্রেণিবিভাগ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। পরবর্তীতে একই গুণসম্পন্ন তন্তুদের এক দলে ফেলে শ্রেণিবিভাগ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে জনগণ একই শ্রেণিভুক্ত তন্তুগুলোর গুণগুণ, যন্ত্র ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সন্ধ্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

উৎস অনুযায়ী বয়ন তত্ত্বকে প্রধানত : দুইভাগে ভাগ করা যায়-১। প্রাকৃতিক তত্ত্ব এবং ২। কৃত্রিম তত্ত্ব

১। প্রাকৃতিক তত্ত্ব (Natural fiber) - প্রাকৃতিক তত্ত্বের মধ্যেও শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন:-

(ক) উদ্ভিদ তত্ত্ব (Vegetable fibers)- উদ্ভিদ তত্ত্ব উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায়, যা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। এরা সেলুলোজ ভিত্তিক হওয়ায় এদের সেলুলোজিক তত্ত্ব বলে। এরা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে-

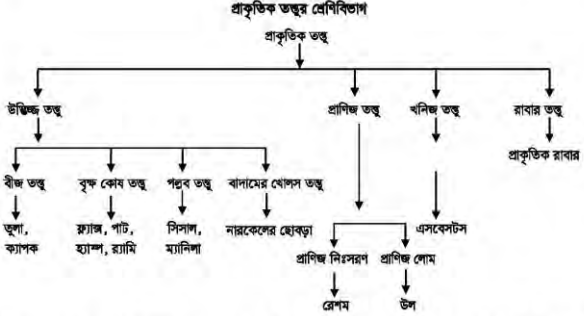
- বীজ তত্ত্ব (Seed hairs)- বীজের চারপাশে যে আঁশগুলো অবস্থান করে তাদের বীজ তত্ত্ব বলে। যেমন-তুলা, ক্যাপক ইত্যাদি।
- উদ্ভিদ বাকল বা বৃক কোষ তত্ত্ব (Bast fibers) - গাছের কাণ্ড থেকে এ তত্ত্ব পাওয়া যায়। যেমন-পাট, ক্ল্যাক্স, র‍্যামি, শণ ইত্যাদি।
- পত্রব তত্ত্ব (Leaf fibers) - এদের ভাসকুলার ফাইবারও বলে। গাছের পাতা, মূল বা ডাটায় পাওয়া যায়। যেমন-পিনা, সিসাল ইত্যাদি।
- বাদামের খোসা তত্ত্ব (Nut husk fibers) - যেমন- নারকেলের ছোবড়া থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব।

(খ) প্রাণিজ তত্ত্ব (Animal fibers) - প্রাণিজ তত্ত্ব প্রাণী বা পোকামাকড় থেকে পাওয়া যায়। এদের মূল উপাদান প্রোটিন, তাই এদের প্রোটিন তত্ত্ব বলেও গণ্য করা হয়। যেমন-

- প্রাণিজ শোম তত্ত্ব (Animal hair fibers) - বিভিন্ন প্রজাতির ভেড়া ও ভেড়া-জাতীয় পশু যেমন- আলপাকা, মোহেয়ার, এঞ্জোরা ইত্যাদির শোমকে পশমতত্ত্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- প্রাণিজ নিসরণ তত্ত্ব (Animal secretion fibers) - রেশম বা গুটি পোকের লালা নিঃসৃত পদার্থ সিল্ক তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(গ) খনিজ তত্ত্ব (Mineral fibers) - মাটির নিচে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শিলার স্তরে স্তরে এক প্রকার আঁশ জমা হয়, যা এসবেসটস নামক বয়ন তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। এরা আয়রন এবং এরূপ অন্যান্য খনিজ যেমন- সোডিয়াম, এলুমিনিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের জটিল সিলিকেট হয়। এরূপ তত্ত্ব এসিড, মরিচিকা ও আগুন প্রতিরোধকম।

(ঘ) প্রাকৃতিক রাবার (Natural rubber) - প্রাকৃতিক রাবারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংকোচন করে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব ও সুতা তৈরি করা হয়।



২। **কৃত্রিম তন্তু (Man made fiber)** - যে সব তন্তু প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়নি, মানুষ বিভিন্ন পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্ভাবন ঘটিয়েছে, তাদের কৃত্রিম তন্তু বলে। কৃত্রিম তন্তুগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে কারখানায় তৈরি করা হয়। এসব তন্তুর কাঁচামাল প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক হতে পারে। এরূপ তন্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাই এদের খাটো বা দম্ভা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। উৎস ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম তন্তুগুলোকে ছয়ভাগের ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) **সেলুলোজিক তন্তু** - ছোট তুলার আঁশ, বাঁশের বা কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক সেলুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃত্রিম সেলুলোজিক তন্তু উৎপাদন করা হয়। যেমন - কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, ডিসকোস রেয়ন ইত্যাদি।

খ) **পরিবর্তিত সেলুলোজিক তন্তু** - প্রাকৃতিক সেলুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেলুলোজের গঠন পরিবর্তন করে এ ধরনের তন্তু উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সেলুলোজ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। যেমন- এসিটেট, ট্রাই- এসিটেট ইত্যাদি।

গ) **সাংশ্রৈষিক তন্তু** - প্রাকৃতিকভাবে সেলুলোজভিত্তিক নয় এমন পদার্থ যেমন-কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যখন এমন পদার্থ সৃষ্টি করা যায়, যা তন্তুর গুণাবলি প্রকাশ করে- সেগুলোকে সাংশ্রৈষিক তন্তু বলে। নানা প্রকার প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- কমলা, বাঘ, পানি, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সংশ্রবণ পদ্ধতিতে আলাদা করে নিয়ে আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একত্র করে এরূপ তন্তু উৎপাদন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে- নাইলন, পলিয়েস্টার, একরাইলিক, ভিনিয়ন, সরন ইত্যাদি তন্তু।

- ঘ) শ্রোটিন তত্ত্ব - ধান, গম, প্রভৃতি শস্য এবং দুধের শ্রোটিনকে রাসায়নিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে কৃত্রিম শ্রোটিন তত্ত্বতে রূপান্তরিত করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে এরা সফলতা লাভ করে নি।
যেমন- এজলন, ক্যাসিন ইত্যাদি।
- ঙ) খনিজ তত্ত্ব - বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এককভাবে বা সংমিশ্রণ অবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে খনিজতত্ত্ব তৈরি করা যায়। যেমন- সিলিকা, লাইমস্টোন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান একত্র করে গঠন করা হয় গ্রাস তত্ত্ব।
- চ) ধাতব তত্ত্ব - এলুমিনিয়ম, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতুকে খনি থেকে বিভিন্ন অপদ্রব্যের সাথে উত্তোলন করার পর পরিশুদ্ধ করে নানা উপায়ে কৃত্রিম ধাতব তত্ত্ব তৈরি করা হয়।
- ছ) অন্যান্য কৃত্রিম তত্ত্ব - এলজিনেট, টেক্সটন ইত্যাদিও মানুষ দ্বারা তৈরি তত্ত্ব। সমুদ্র শৈবাল থেকে প্রাপ্ত এলজিনেট তত্ত্ব পানিতে দ্রবীভূত হয় যায় এবং গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

প্রাথমিক পর্যায়ে বয়ন তত্ত্বের জন্য প্রাকৃতিক উপস্র ও যোগানের উপর নির্ভর করতে হলেও ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে মানুষ কৃত্রিম তত্ত্বের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। দেখা গেছে, ১৯০০ সাল থেকে কৃত্রিম তত্ত্বের উদ্ভাবন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আরও উচ্চমানের কৃত্রিম তত্ত্ব আবিষ্কারে সফল হন।

কাজ - প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ পোকারের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৩-৪ : বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যবহার

ভূলা তত্ত্বের ব্যবহার - পোশাক পরিচ্ছদে ভূলা তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা এর রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার ক্ষমতা। এই তত্ত্বের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম, তাই এই তত্ত্বের তৈরি বস্ত্র-বিছানার চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, মশারি, লেপ, সোফার কাপড়, ন্যাপকিন, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি কম ব্যয়বহুল হয়। এ ছাড়া এর অর্থনৈতিক মূল্যও অনেক। কেননা এর যত্ন নেওয়া সহজ। পরিধেয় গুণাবলি ভালো হওয়ার ভোক্তার কাছে এর চাহিদাও বেশি। সুতি বস্ত্র বেশ তাপ সহ্য করতে পারে, এজন্য ইন্সট্র করার সময় বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না। গরম পানি দিয়ে প্রয়োজনে সিদ্ধও করা যায়। সুতি বস্ত্র মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সব ঋতুতে ব্যবহার করা যায়। হালকা ওজনের বস্ত্রও প্রয়োজনে এ তত্ত্ব দিয়ে তৈরি করা যায়। মূলত আরামের জন্যই সুতি বস্ত্র আজ তত্ত্বের রাজা হিসেবে সমাদৃত।

অনেকদিন যাবৎ সূর্যালোকের সঙ্গর্গে থাকলে সুতি বস্ত্র হলুদ রং ধারণ করে এবং দুর্বল হয়ে যায়। স্নাতকসৈতে অবস্থায় রাখলে তিলা পড়ে। এই তত্ত্ব উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, ফুটন্ত পানিতে রাখলে এই তত্ত্বের কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষার দিয়ে সুতি বস্ত্র ধোয়া যায়। শক্তিশালী এসিডে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মৃদু এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রিচিং করা যায়, তবে রিচিংয়ের ফলে কাপড়ের আয়ু হ্রাস পায়। ভূলা তত্ত্বের রং ধারণ ক্ষমতা ভালো, পানিতে ভিজলে ভূলা তত্ত্বের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাই ধোয়ার সময় চাপ ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

ফ্ল্যাঞ্জ তত্ত্বের ব্যবহার - ফ্ল্যাঞ্জ খুব শক্তিশালী তত্ত্ব। এটা দিয়ে সুস্থ সুতা ও মসৃণ গিনেন বস্ত্র তৈরি করা যায়, যা খুব মজবুত ও ঠাণ্ডা। এরূপ বস্ত্র পরিধানে আরাম বোধ হয়, এগুলো সহজেই ধোয়া যায়। আকর্ষণীয়, অভিজাত, সমতলভাবে অবস্থান করে এবং সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে- তাই টেবিল কভারের জন্যও সহজেই

নির্বাচন করা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য ও ধোয়ার উপকরণের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সূর্যালোককে নষ্ট হয় না। পরিধেয় ও গৃহস্থালী বস্ত্র হিসেবে এর জনপ্রিয়তা অনেক। তত্ত্বের গঠনগত কারণে সহজে ময়লা হয় না। পানি শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় এ তত্ত্বের তৈরি লিনেন বস্ত্র গরমের দিনের জন্য আরামদায়ক। সুতির বস্ত্রের তুলনায় লিনেন বস্ত্র বেশি টেকসই হয়।

কাছ – তুলা এবং ফ্ল্যান্স তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

রেশম তত্ত্বের ব্যবহার – রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয়। এই তত্ত্ব নরম, মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বিলাসবহুল ও ফ্যাশন বহুল বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। রেশমি বস্ত্র সুতি ও লিনেনের চেয়ে ওজনে হালকা। এর বহুমুখী ব্যবহার উপযোগিতার কারণে শার্ট, ব্লাউজ অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, সম্ভ্রামূলক উপকরণের উপযোগী বস্ত্র ইত্যাদি এ তত্ত্ব থেকে তৈরি করা হয়। স্থিতিস্থাপকতার জন্য এরূপ বস্ত্র দিয়ে নানা ধরনের কুঁচি, প্লেট, বালার প্রভৃতি ডিজাইনযুক্ত পোশাক সহজেই তৈরি করা যায়। রেশমি বস্ত্র দামি ও যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেক দিন স্থায়ী হয়।

পশম তত্ত্বের ব্যবহার – পশম তাপ কুণ্ঠরিবাহী। তাই পশমিবস্ত্র পরিধানে গরম অনুভব হয়। শীতবস্ত্র হিসেবে পশমের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– সোয়েটার, মোজা, মাফলার, কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি। এ ছাড়া পশম দিয়ে নানা ধরনের কম্বল, শাল, কার্পেট ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। থোয়া ও ইন্ড্রি করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পশমি বস্ত্র বেশ দামি। যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায় এবং টেকসই হয়।

কাছ – রেশম ও পশম তত্ত্বের ব্যবহার উল্লেখ কর।

রয়েন তত্ত্বের ব্যবহার – অন্যান্য বস্ত্রের তুলনায় রয়েন সস্তা। বিভিন্ন মূল্যের রয়েন বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায় বলে এরূপ বস্ত্র সহজেই অনেকে কিনতে পারে। রয়েন তত্ত্বের একটি গুণ হলো এর আকর্ষণীয় রূপ। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মাত্রার এরূপ উচ্ছল তত্ত্ব বাজারে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বহুমুখী ব্যবহারের জন্য এই তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয়। এরূপ তত্ত্বের নির্মিত কার্পেট, পর্দা ইত্যাদি ঘরের নতুনত্ব আনয়ন করে। রয়েন তত্ত্বের বস্ত্র মজবুত, উচ্ছল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রয়েন হতে নানা রকম অভিজাত বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। এরূপ বস্ত্র সহজে থোয়া ও যত্ন নেওয়া যায়। এই তত্ত্বের পানি শোষণ ক্ষমতা কম বলে দ্রুত শুকায়।

নাইলনের ব্যবহার – নাইলনের বস্ত্র মজবুত ও ওজনে হালকা হওয়ায় এর বহুমুখী ব্যবহার দেখা যায়। টেকসই ও স্থিতিস্থাপক বলে অভাবসি, মশারি, বিছানার চাদর, আসবাবপত্রের ঢাকনা, ছাতর কাপড়, ফিতা, চপের নেট, গেস, সুতা, মাছ ধরার জাল, চামড়া জাতীয় সামগ্রীর আস্তরণ, কার্পেট, গলফ খেলার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে নাইলনের সুতা ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। নাইলনের বস্ত্র সহজেই থোয়া ও শুকানো যায়, এজন্য বর্ষার দিনে বেশি ব্যবহার করা হয়। নাইলনের তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্বের সমন্বয়ে নানা ধরনের গুণসম্পন্ন বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন– নাইলন–সুতি, নাইলন–পশম, নাইলন– রয়েন ইত্যাদি। ময়লার প্রতি আকর্ষণ কম বলে সহজে ময়লা ধরে না। বেশি ইস্ত্রি করারও দরকার হয় না।

কাছ– রয়েন ও নাইলন তত্ত্বের ব্যবহার পোষ্টারের মাধ্যমে উল্লেখ কর।

পাঠ - ৫-৬ : তত্ত্ব শনাক্তকরণ

বাজারে নানা ধরনের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও মিশ্র তত্ত্বর বস্ত্র দেখা যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে একটি কাপড়ের তত্ত্বর প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টকর। একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই তা স্থির করতে হয়। সাধারণত যেসব পরীক্ষার সাহায্যে তত্ত্বর প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তাকেই তত্ত্ব শনাক্তকরণ বলে। তত্ত্ব চেনার জন্য যেসব পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয় সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

ক) তত্ত্বর ভৌত পরীক্ষা (Physical test) - ভৌত পরীক্ষাগুলো ঘরে বসেই করা যায়। এগুলো অপ্রযুক্তিগত বা non technical হওয়ায় এসব পরীক্ষার উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্বর প্রকৃতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় মাত্র, সঠিকভাবে তত্ত্বর প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না।

ভৌত পরীক্ষাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

- ১। স্পর্শ করে পরীক্ষা - অনেক দিনের অভিজ্ঞতার কারণে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বর তৈরি কাপড় শনাক্ত করতে পারেন। যেমন— সুতির কাপড় হাত দিয়ে ঘষলে ঠান্ডা ও নরম অনুভূতি জাগে। লিনেন কাপড় সুঁতি কাপড়ের তুলনায় অনেক ঠান্ডা ও মসৃণ মনে হয়। তবে পশমি বস্ত্র গরম ও নমনীয় এবং রেশমি বস্ত্র গরম ও মসৃণ মনে হয়। দুই বা ততোধিক তত্ত্ব দিয়ে মিশ্রিত তত্ত্বর কাপড় এ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন।
- ২। চাঞ্চুস পরীক্ষা - ভৌত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা হলো চাঞ্চুস পর্যবেক্ষণ। তত্ত্বর দৈর্ঘ্য, উচ্ছলতা ইত্যাদি দেখে তত্ত্বর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
- ৩। তাঁজ করে পরীক্ষা - একটি বস্ত্র দুই তাঁজ করে আঙুলের সাহায্যে চেপে ধরতে হবে। বস্ত্রটি যদি ফ্ল্যাক তত্ত্বর হয় তাহলে তাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হবে এবং এ দাগ সহজে মিলে যাবে না। সুতির বস্ত্রেও তাঁজের দাগ পড়বে কিন্তু এ দাগ লিনেনের মতো এত সুস্পষ্ট হবে না। রেশমি ও পশমি বস্ত্রে এ পরীক্ষায় কোনো তাঁজ পড়বে না। কাজেই এ পরীক্ষার সাহায্যে সুঁতি- লিনেন ও রেশমি- পশমি বস্ত্রের পার্থক্য শনাক্ত করা যায়।
- ৪। পাক খুলে পরীক্ষা - বস্ত্র থেকে কয়েকটি সুতা বের করে তাদের পাক খুলে ফেলাতে হবে। বস্ত্রটি পশম তত্ত্বর হলে পশমি সুতায় পশমের স্বাভাবিক তাঁজ বা ঢেউ দেখা যাবে। এ ছাড়া একটি সুতাকে হিড়ড়ে তার হেঁড়া অংশ পরীক্ষা করেও তত্ত্বর উৎস শনাক্ত করা যায়। যেখানে তত্ত্বটি হিড়ড়ে যাবে তার সম্মুখভাগ যদি দেখতে সুঁচের মতো সরু হয় তবে তা ফ্ল্যাক তত্ত্ব বুঝতে হবে। অন্যদিকে যদি সম্মুখভাগ দেখতে একটি তুলির সম্মুখভাগের মতো মোটা হয় তবে তা তুলা তত্ত্ব বলে জানতে হবে।
- ৫। ডিঙিয়ে পরীক্ষা - এ পরীক্ষার সাহায্যে ফ্ল্যাক ও নাইলন তত্ত্ব সহজেই চেনা যায়। কেননা লিনেন বস্ত্রের পানি শোষণ ক্ষমতা বেশ ভালো। আঙুলের সাহায্যে এক ঝোঁটা পানি কোনো কাপড়ের উপর রাখার সাথে সাথে যদি পানি কাপড়ে প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে কাপড়টি ফ্ল্যাক তত্ত্ব দিয়ে প্রস্তুত। অন্যদিকে শোষণ ক্ষমতা না থাকার কারণে নাইলনতত্ত্বর বস্ত্রে পানি প্রবেশ করবে না।
- ৬। গরম ইস্টি দিয়ে পরীক্ষা - এ পরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম তত্ত্বর বস্ত্র সহজেই শনাক্ত করা যায়। একটি

ইসিদ্ধ খুব গরম করে কাপড়ের উপর চেপে ধরলে যদি কাপড়টি এসিটেট, নাইলন বা ডেক্রোন তন্তুর হয় তবে তা একেবারেই গলে যাবে। তুলা, ফ্ল্যাক্স, রেশম, পশম বা রেয়নের হলে কাপড়ে লালচে গোড়া দাগ পড়বে।

- ৭। সেবেল দেখে পরীক্ষা – কাপড়ের গায়ে সংযুক্ত সেবেলে তন্তু সম্পর্কিত নানা ধরনের তথ্য দেওয়া থাকে, যা দেখে একজন ক্রেতা কাপড়টি কোন ধরনের তন্তুর তৈরি সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।
- ৮। কাপড় পুড়িয়ে পরীক্ষা – পোড়ান পরীক্ষা একটি খুব ভালো প্রাথমিক পরীক্ষা। এ পরীক্ষার জন্য করণীয় কাজগুলো হচ্ছে— কাপড়ের টানা সূতা হতে দুই একটা সূতা নিয়ে পাক খুলে আগুনের শিখায় ধরে প্রজ্জ্বলনের নমুনা ও ছাই পরীবেক্ষণ করতে হবে এবং তন্তু থেকে যে গন্ধ বের হয় তা লক্ষ করতে হবে। এরপর পড়েন সূতা নিয়ে পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। বুনন প্রক্রিয়ায় কাপড়টি তৈরি না হলে সূতার পরিবর্তে এক টুকরা কাপড় পোড়ান পরীক্ষায় ব্যবহার করতে হবে।



পোড়ানো পরীক্ষায় তন্তুর ব্যবহার



পোড়ানো পরীক্ষায় কাপড়ের ব্যবহার



পোড়ানো পরীক্ষায় ছাই বা অবশিষ্টাংশ

তন্তু পোড়ান পরীক্ষার ফলাফলের চার্ট

| তন্তু | পোড়ান ধরন | শিখার ভেতর প্রতিক্রিয়া | শিখার বাইরে প্রতিক্রিয়া | গন্ধ | অবশিষ্টাংশ বা ছাই |
|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| তুলা এবং ফ্ল্যাক্স | শিখাসহ প্রজ্জ্বলিত হয়। সংকুচিত হয় না। | দ্রুত পোড়ে। হালকা বড় শিখা দেখা যায়। | শিখা থেকে সরিয়ে আনার পরও পুড়ে থাকে। | কাগজ পোড়ার মতো গন্ধ রে হয়। | পাশকের মতো হালকা, নরম, ফুল রঙের অবশিষ্টাংশ থাকে। |
| উল, সিক | বৌকড়ানো ছুপের মতো গুচ্ছের সৃষ্টি হয়। | ধীরে পোড়ে এবং পোড়ার সময় মুহূর্ত হয়। | সাধারণত নিজেই নিতে যায়। | চুল বা পশুর পোড়া গন্ধ রে হয়। | শক্ত অর্ধ সন্ধ্যা ভাঙা যায়, এমন হেট কাশে গুটিকা সৃষ্টি হয়। |
| নাইলন তন্তু | আগুনের শিখায় গলে যায়, সংকুচিত হয়। | গলতে গলতে ধীরে ধীরে পোড়ে। | নিজে নিজেই নিতে যায়। | শাকের মতো গন্ধ হয়। | শক্ত, মজবুত, ফুল অথবা তামাটে গুটিকা পাওয়া যায়, যা ভাঙা যায় না |

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বয়ন তত্ত্বের প্রধান বা মুখ্য গুণাবলি কোনটি?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক) বিশেষণ | খ) নমনীয়তা |
| গ) সংকোচন | ঘ) উজ্জ্বলতা |

২। তত্ত্বের ব্যাসের উপর কাপড়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি নির্ভরশীল?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক) উজ্জ্বলতা | খ) স্বস্বসে |
| গ) স্থিতিস্থাপকতা | ঘ) নমনীয়তা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনাদ বৃষ্টিতে ভিজে এসে তার স্কুল ড্রেস খুলে রাখল। দুই দিন পর তার মা ধোয়ার জন্য বের করে দেখলেন জামায় ছোট ছোট কালো দাগ পড়েছে। ফলে জামাটি পরার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

৩। আনাদের জামাটি কোন তত্ত্বের তৈরি?

- | | |
|---------|----------|
| ক) রেশম | খ) সুতি |
| গ) পশম | ঘ) নাইলন |

৪। আনাদের জামাটি পরার উপযোগী করার উপায় হলো —

- ব্রিটিশের ব্যবহার
- ধোয়ার সময় ঘবে ঘবে ধোয়া
- গাঢ় এসিডে ধোয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাজমা বেগম পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করেন। কিছুদিন হলো তিনি গরমে হাঁপিয়ে উঠছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যকষ্ট দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বললেন, তোমার পরিধেয় বস্ত্রের কারণে এমনটি হচ্ছে এবং তাঁরা নাজমাকে আরামদায়ক কাপড় পরার পরামর্শ দিলেন।

ক. বীজ তত্ত্ব কী?

খ. সাপ্রেমিক তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

গ. নাজমা বেগম কোন ধরনের কাপড় ব্যবহার করছেন—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাজমা বেগমের এই অবস্থায় সহকর্মীদের পরামর্শটি কী যুক্তযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোশাকে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি

দেহের সৌন্দর্য হুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত স্মৃতিসন্মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। যেহেতু পোশাক-পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, তাই এই শিল্প প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সূত্র প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে খুব কম ব্যক্তিই নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটিসমূহ সুপরিচ্ছদিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

পাঠ-১-৩ : পোশাকে শিল্প উপাদান

পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বহু বছর আগে থেকেই কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই উপাদানগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হলেও ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল সব সময়ই এক- সেহেঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত বা অলঙ্কৃত করা। পোশাকশিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- রং, বিদ্যুৎ, রেখা, আকার ও জমিন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে এই শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রং- আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুই নিজস্ব রং রয়েছে। এই রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাক পরিচ্ছদে সুস্থভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বর্ণচক্রের রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। রং মূলত তিন প্রকার:- ১। মৌলিক রং ২। গৌণ রং এবং ৩। প্রান্তিক রং।

- ১। মৌলিক রং - লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মৌলিক রং। মৌলিক বা প্রাথমিক রংগুলো বিপুল রং। কেননা এগুলো অন্যান্য রঙের সমমিশ্রণে তৈরি হয় না বরং এদের সমমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয়।
- ২। গৌণ রং - দুইটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়। এদেরকে মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা হয়। যেমন-হলুদ + নীল = সবুজ, নীল + লাল = বেগুনি, লাল + হলুদ = কমলা।
- ৩। প্রান্তিক রং - মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যে কোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রান্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন- হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ, নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ, নীল + বেগুনি = নীলাভ বেগুনি, লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি, লাল + কমলা = লালচে কমলা, কমলা + হলুদ = হলদে কমলা।



কাজ – মৌলিক রং, পৌণ রং এবং প্রান্তিক রং উল্লেখ করে একটি বর্ণচক্র তৈরি কর।

প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রঙগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রঙগুলো উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রঙগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রঙগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরমভাব জন্মিত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং অনেকের মনোবোণ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং মনে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায় এবং এরা অনেকের মনোবোণ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের রঙের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

পোশাকে রঙের ভূমিকা–

পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাহুর্ময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানুষ না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঙের কারসাজি। যেহেতু রঙের ভূমিকা ব্যাপক তাই পোশাকের রঙের প্রতি আমাদের সজ্ঞান দৃষ্টি রাখতে হবে। পোশাকে রঙের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১. সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন – রং চেহারার মধ্যে আচর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পোশাকের হুটিপূর্ণ রং নির্বাচন ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করে দিতে পারে। পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
২. দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান – পরিধানকারীর দেহ ত্বকের উপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।
- ফর্সা একজন মেয়েকে যে কোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখাবে। অন্যদিকে গায়ের রং শ্যামলা হলে গাঢ় রং বর্ণন করে হালকা রং নির্বাচন করতে হবে, যাতে তার গায়ের রং উজ্জ্বল দেখায়।

- শ্যামলা মেয়েরা যদি মানানসই হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে তবে তাদের কিছুটা কুর্সা লাগবে।

৩. **দেহাকৃতির পরিবর্তন** – রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

- লম্বা ও মধ্যম দেহাকৃতির মেয়েরা বয়সের সাথে সজাতি রেখে সব রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে।
- খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির পক্ষে দুই রং বিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না। এ ধরনের মেয়েদের সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই মানায়। হালকা রঙের শাড়ি, ব্লাউজ এরা নির্বাচন করতে পারে।
- মেয়েদের পাতলাভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কমানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক নির্বাচন করা যেতে পারে। সবুজ কোমরের অধিকারী শাড়ি ও ব্লাউজ বিপরীত রঙের হতে পারে, কিন্তু যাদের কোমর ভারী তারা একই রঙের জামা কাপড় পরতে পারে।
- মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরলে আরও মোটা দেখাবে। তাই হালকা রঙের সাপোয়ার, কমিজ, গুডুনা, শাড়ি, ব্লাউজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ এরা নির্বাচন করতে পারে।

৪. **প্রাধান্য সৃষ্টি** – পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে হলে উক্ত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বা গাঢ় রং নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন—

- ফ্রকের গাঢ় রঙের ডিজাইন ব্যবহার করে ফ্রকটিকে আকর্ষণীয় করা যায়।
- হালকা রঙের শাড়িতে গাঢ় রঙের ডিজাইন সৃষ্টি করেও প্রাধান্য আনা যায়।
- বিপরীত রং ব্যবহার করেও পোশাকের আকর্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।

আবার কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে না চায় তাহলে শীতল বা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে পারে, এতে করে শরীরের কোনো অংশই বেশি প্রাধান্য পায় না।

৫. **পোশাকে সমন্বয় রক্ষা** – রং পোশাকের ডিজাইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই দেহ ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রঙের সম্বন্ধ এমন হওয়া উচিত, যাতে সব রং মিলে একটি সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। একটি পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করতে হলে –

- দুটি রঙের ব্যবহার এক না হয়ে একটি অপরটি হতে বেশি হওয়া উচিত।
- আবার যখন হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হয় তখন পোশাকের ছোট ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করা উচিত।
- এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য যে রং মানানসই হবে পোশাকে সে রং দিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

কাছ – তোমার দেহাকৃতি বিবেচনা করে কোন রঙের পোশাক ব্যবহার যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর।

পোশাকে রেখার প্রভাব – পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতোগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে উঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খাটো, কখনো মোটা, আবার কখনো রোগা মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রুটি গোপন করা যায়।

রেখা মূলত দুই প্রকার– (১) খাড়া রেখা ও (২) বক্র রেখা। এ ছাড়া রেখার গতিপথের ওপর নির্ভর করে রেখাকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১। খাড়া রেখা ২। সমান্তরাল রেখা ৩। কোনাকুনি রেখা ৪। বক্র রেখা ৫। তীর্যক রেখা এবং ৬। ভল্ল রেখা।

প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমণ্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সূচিভিত্তিক নির্বাচন ও সুস্থ বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এখানে পোশাকের ওপর বিভিন্ন রেখার প্রভাব তুলে ধরা হলো।

১। **খাড়া রেখা** – খাড়া বা লম্বা রেখা গম্বীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সত্যতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো কফুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। তাই এই রেখার নকশায় পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।



পোশাকে খাড়া রেখা

২। **সমান্তরাল রেখা** – এ ধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ ধরনের মেয়েরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়ালি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে। এই রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুই দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।



সমান্তরাল রেখা

৩। **বক্র রেখা** – বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ-উদ্ভাস বোঝায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্র রেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমলীয়তা বাড়িয়ে দেয়। এন্থপ রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।



বক্র রেখা

৪। **তীর্যক বা ঝোঁক রেখা** – তীর্যক রেখা সত্যমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুই দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, সর্ব ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে।



তীর্যক রেখা

৫। ঝাঁকঝাঁক বা জিপজ্যাপ রেখা – এই রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এই রেখাগুলো কোণের মাত্রা ও দিকের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় খাটো ও মোটা মনে হয়।



জিপজ্যাপ রেখা

পোশাকে বিন্দুর প্রভাব – যে কোনো শিল্পের building block বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনয়ন করা যায়।



পোশাকে বিন্দুর প্রভাব

কাজ – পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের উপর একটি চার্ট তৈরি কর।

পোশাকে আকৃতির প্রভাব– দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। আর ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে জানা।

- প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেহের বিভিন্ন পেশি ও অংশ বিশেষের গঠনভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লক্ষ রাখা দরকার, যাতে পরিচ্ছদ বেশি আঁটসাঁট না হয়। বেশি আঁটসাঁট পোশাক সুরুটি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয় না বরং দেহের ত্রুটিগুলো এতে আরও প্রকট হয়ে ওঠে।
- পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় খাটো, লম্বা, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরে। এতে তাদের উচ্চতা আরও কমে যায় এবং তাকে আরও মোটা লাগে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী।
- পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক থাকে। যেমন– সুন্দর কোমর, দৈহিক উচ্চতা, সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। যেমন– স্ফীত হিপ, প্রশস্ত কাঁধ, খাটো গ্রীবা ইত্যাদি। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিষ্কৃত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করে সুন্দর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।
- ব্লাউজ বা কমিজে ইয়ক, চিকন টাক, হুঁটি, বুকো তাগি, পকেট, চণ্ডা কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের ত্রুটি ঢাকা যায়। বেশি স্ফীত বুক এবং প্রশস্ত কোমরের অধিকারীদের জন্য টিলোটলা পোশাক উপযুক্ত। প্রশস্ত কোমরের ত্রুটি সুপরিষ্কৃত মানানসই কোমর রেখার মাধ্যমেও ঢাকা যায়।
- যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'তি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোট গলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উঁচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

- মানুষের মুখের আকৃতি নানা রকম হয়। যেমন-লম্বা, গোল, চারকোনা, ডিম্বাকৃতি। ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলই আদর্শ। এসব মুখাকৃতির মেয়েরা সব ধরনের গলার নকশাসমূহ পোশাক বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করতে পারে। যাদের মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার তাদের 'তি' আকৃতি এবং 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। লম্বা মুখ হলে ছোট গলার নকশা মানানসই হয়। এ ধরনের মেয়েরা উচু কলারের জামা পরলে তাদের গ্রীবার সরু ভাব ঢাকা পড়ে।



ডিম্বাকৃতি মুখে গলার নকশা



গোল বা চারকোনা মুখে গলার নকশা

- অনেকের পেছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাংস উচু হয়ে থাকে। তা ঢাকার জন্য কেউ কেউ উচু কলার যুক্ত রাউন্ড বা জামা পরে। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক উপায় হচ্ছে রাউন্ডের গলার ইন্টারটিকে ওই মাংসপিণ্ডের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা। এভাবে তৈরি রাউন্ড পরলে ঘাড়ের কাছে ত্রুটি তত প্রকট হবে না।
- চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলাকৌরিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যেমন- লম্বা চেহারার মেয়ে যদি লম্বা কানের দুল কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে, তাহলে তাকে আরও লম্বা মনে হবে।

কাজ - কোন ধরনের সেহাকৃতির জন্য কী ধরনের পোশাকের ডিজাইন হওয়া উচিত উল্লেখ কর।

পোশাকে জমিনের প্রভাব - কাপড়ের জমিন নানা ধরনের হয়। পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় দেখতে উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে এবং সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। সুতি, রেশমি, পশমি ছাড়াও তসর, অ্যাভি, অর্গ্যান্ডি ইত্যাদি কাপড়ও অনেক জমিন দেখা যায়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতর জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন- নরম, মধ্যম, দৃঢ়, ওজনে ভারী, চকচকে, নিম্প্রভ ইত্যাদি। জমিনের সূচ্য ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটাভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

১. জার্সি, শিফন ইত্যাদি নরম প্রকৃতির কাপড়। এসব কাপড়ের পোশাক শরীরের সাথে সেটে থাকে, ফলে শরীরের দোষ বা গুণ সহজে বোঝা যায়। নরম কাপড় পরিধানে আরাম অনুভূত হয়।
২. মধ্যম ধরনের দৃঢ় প্রকৃতির কাপড়, যেমন- ডেনিম কাপড় শরীরের সাথে বেশি সেটে থাকে না, ফলে শরীরের দোষ সহজে বোঝা যায় না।

৩. দৃঢ় প্রকৃতির যেমন- ট্যাফেটা-জাতীয় কাপড়ে পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা দেখায়।
৪. ভারী যেমন- পশমি কাপড়ে আপাতদৃষ্টিতে দেহ বড় দেখায়।
৫. ফ্রান্সেল, ডেনিম প্রভৃতি নিম্নপ্রভ জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে, তাই এরূপ কাপড়ে কোনো কস্তু ছোট দেখায়। বয়স্ক ও মোটা মানুষের জন্য এরূপ বস্ত্র উপযোগী।
৬. চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন- সার্টিন, মারশেরাইজ করা সুতির বস্ত্র ইত্যাদি। যেসব কাপড়ে ধাতব তন্তুর কাজ থাকে সেগুলোর জমিনও চকচকে হয়। লম্বা, রোগা ও অল্প বয়সীদের জন্য এমন জমিন মানানসই।

সৃষ্টিত দেহাকৃতি অধিকারীরা সব ধরনের জমিনের পোশাকই পরতে পারে। ঋতু, দেহের আকৃতি ও বয়স ভেদে বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করতে হয়।

কাজ - পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার জন্য কী ধরনের জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন - উল্লেখ কর।

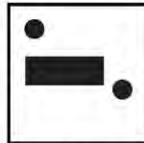
পার্শ্ব-৪-৫ : পোশাকে শিল্পনীতি

পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালায় জ্ঞান আবশ্যিক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের ভারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছন্দ ও মিল এ নীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজাইনের নীতিমালায় জ্ঞান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারহোব পরিকল্পনা ইত্যাদি শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

পোশাকে ভারসাম্য- কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য। নিম্নে দুই ধরনের ভারসাম্য দেখানো হলো-



প্রত্যক্ষ ভারসাম্য



অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

১. **প্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Formal balance)** - লম্বাশম্ভি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক এ ক্ষেত্রে একই রকম দেখায়। এরূপ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এ ধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একঘেয়ে লাগতে পারে। পোশাকের দুই দিকে একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুইটি পকেট কিংবা একই ধরনের প্ৰিট দিয়ে পোশাকের প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

২. **অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Informal balance)** - এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমভঙ্গনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সম দূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না। এ ধরনের বিন্যাস খুবই চিত্তাকর্ষক (interesting), তবে এক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তা প্রয়োজন। এরূপ বিন্যাসে—

- এক দিকে বড় জিনিস একটি ও অন্য দিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রাখা যেতে পারে।
- অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোশাকে অনুপাত - পোশাকের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত। অনেক ব্যক্তি আছে যারা অনুপাত বোঝ নিয়েই জ্ঞান গ্রহণ করে, তবে এ বিষয়ে সহজেই শিক্ষা লাভ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে এটি একটি অথকর ব্যাপার। বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রয়োজন— গজ কিতা, স্কেল ইত্যাদি। দেখা গেছে বোতামের আকার ও রং বাছাই, দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব, গেসের চওড়া বাছাই এবং এদের মাধ্যমে কয়েকটি সারি করতে হলে সারিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপাত মেনে চলা আবশ্যিক।

কাজ - একটি পোশাক কীভাবে ভারসাম্য আনা যায় তা বর্ণনা কর।

পোশাকে ছন্দ - রং, রেখা, বিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঙের দিকে আকৃষ্ট হয়। পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথা—

১) **পুনরাবৃত্তি (Repetition)** - রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, গেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে, তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়।



পুনরাবৃত্তি

২) **বিকিরণ (Radiation)** - একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস, গুঁতি, সিকুয়েল, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের ছন্দ আনা যায়।



বিকিরণের মাধ্যমে ছন্দ

৩) **ক্রমবিন্যাস (Gradation)** - রঙের সেড, রেখা বা আকৃতির ক্রম পরিবর্তন করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। রং বা রেখার এই পরিবর্তন প্রস্থ বরাবর না করে দৈর্ঘ্য বরাবর করলে চোখ বেশি আন্দোলিত হয়।



পোশাকে বিকিরণ ও ক্রমবিন্যাস

৪) **নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity)** - পোশাকে সরল, ডেউ খেলানো, দ্বিগুণ্য ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে ছন্দ আনা যায়। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভাঙার জন্য আড়াআড়ি বা কোনাকুনি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- কুচি দেওয়া লম্বাশামি রেখার পোশাকে আড়াআড়ি রেখার পকেটের ব্যবহার।



রেখার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নতা

পোশাকে প্রাধান্য - পোশাকের যে অংশ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের কিছু সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেখা গেছে যে দেশের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের কেট, বোতাম, লেন্স ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।



পোশাকে প্রাধান্য

পোশাকে মিল - একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য -



পোশাকে মিল

- একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়।
যেমন- বর্গাকার বা স্কোয়ার গলার সাথে বর্গাকৃতি পকেট সংযোজন করা যেতে পারে।
- সালোয়ার, কামিজ ও গুড়নার রঙের সাথে মিল থাকতে হবে।
- ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে।
- পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের (Accessories) মিল থাকতে হবে।

তবে অভিরিক্ত মিল আবার অনেক সময় একত্রেই ভাব আনয়ন করে। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।

কাজ – স্কুলের ক্লাশ পার্টিতে তোমার পোশাক নির্বাচনের সময় কীভাবে মিল রক্ষা করবে বর্ণনা দাও।

পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। তাই পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান সবারই অঙ্গবিস্তর থাকা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বকু রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?

- | | |
|-------------|------------|
| ক) নমনীয়তা | খ) সততা |
| গ) সাহস | ঘ) বিশ্রাম |

২। সার্টিং কাপড়ের জামা পরিধানে ভারী গঠনের মেয়েকে কেমন দেখাবে?

- | | |
|----------|----------|
| ক) লম্বা | খ) মোটা |
| গ) রোগা | ঘ) পাতলা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিসা তার সাদা রঙের কামিজের নীচের অংশে কালো রঙের সুতার কাজ করে। এতে তার জামাটি বেশ সুন্দর দেখায়।

৩। লিসা জামাটিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক) ভারসাম্য | খ) প্রাধান্য |
| গ) অনুপাত | ঘ) ছন্দ |

৪। লিসার জামাটিতে—

- দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়।
- পোষাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়।
- রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

স্বজনবীণ প্রশ্ন

- ১। গোলপাল চেহারার খাটো প্রকৃতির মেয়ে বন্যা একদিন পোশাক কিনতে মার্কেটে যায়। সমান্তরাল রেখার নকশায়ুক্ত জামা ও উঁচু কলার দেওয়া গলার বড় ছাপায়ুক্ত জামা দুটি তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু সব কিছু চিন্তা করে সে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলায়ুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা তার নিজের জন্য কিনে আনে।

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি কোনটি?

খ. পোশাকের তারসাম্য বলতে কী বোঝায়?

গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশায়ুক্ত জামাটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

- ২। সাবা ও সানা দুই বোন। উভয়েরই গায়ের রং ফর্সা হলেও দেহের গঠন ও আকৃতিতে দুইজন একেবারেই বিপরীত। একদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে দুইজনেই নীল রঙের শাড়ি পরে যায়। অনুষ্ঠানের সবাই পাতলা গড়নের সাবার প্রশংসা করলেও সানার প্রতি কেউ অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়নি।

ক. রং মূলত কত প্রকার?

খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাবার প্রশংসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায় হয়েছে— বিশ্লেষণ কর।

বঠদশ অধ্যায়

বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ

বস্ত্রশিল্পে ছাপা ও রংকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারখানায় যখন বস্ত্র প্রস্তুত হয় তখন তাকে যে কেব্রিক বলে। সত্যিকার অর্থে এরূপ বস্ত্র সরাসরি বাজারে খুব একটা ছাড়া হয় না। বস্ত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছাপা ও রংকরণের পর বাজারজাত করা হয়। এতে করে বস্ত্রের আকর্ষণ ক্ষমতা ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। রুচি প্রকাশের জন্য বস্ত্রের উপর স্থান বিশেষে বিভিন্ন রং প্রতিকলিত করার প্রাণালিকে বস্ত্র ছাপা বলে। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর রং বেরং এর নকশা তৈরি করে অভ্যন্তর আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। ব্রক, বাটিক, স্ক্রিন, স্টেনসিল, ব্রোশার ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বস্ত্র ছাপার কাজ করা যেতে পারে। অন্যদিকে রংকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাপড়টি রঙের প্রবণে ডুবিয়ে সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগিয়ে দেওয়া হয়। রংকরণের প্রক্রিয়াটি বস্ত্র তৈরির পূর্বে অর্থাৎ তত্ত্ব বা সূতার মধ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার অনেক সময় টাই-ডাই পদ্ধতিতে সুকৌশলে কাপড়টি বেঁধে রঙের প্রবণে ডোবাতেও সুন্দর একটি নকশা কাপড়ে ফুটিয়ে তোলা যায়।



ব্রক



টাই-ডাই



বাটিক

পাঠ ১ - বস্ত্র ছাপা

বস্ত্রশিল্পে প্রিন্টিং বা ছাপা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার এটি অন্যতম পদ্ধতি। বস্ত্র ছাপার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একজন প্রিন্টার তার প্রয়োজন, সামর্থ্য, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুসারে ছাপার নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেছে নেন। বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটিতে সম্পূর্ণ বস্ত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে একই বর্ণে, একই পাত্রে সমভাবে রঞ্জিত করে তোলা হয়। আর ছাপা পদ্ধতিতে বস্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে এক বা একাধিক বর্ণের সমারোহ ছটিয়ে বস্ত্রটিকে নকশানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়।

আবার রং করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রং নিয়ে, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি বা অন্য কোনো প্রবণ যোগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্বের প্রবণে মোটামুটি অনেক সময় ধরে বস্ত্রকে নিমজ্জিত রাখা হয়। প্রথম দিকে তাপমাত্রা কম থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে বস্ত্রের সব জায়গায় সমানভাবে রং লাগে। কিন্তু ছাপার বেলায় বেশি ঘনত্বের রঙের পেন্ট ব্যবহার করা হয়। এই পেন্ট

বস্ত্রের উপরিভাগে শুধুমাত্র নকশাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এরপর দ্রুত শুকিয়ে তাপ বা বাষ্প ব্যবহার করে সেই রকবে বস্ত্রের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাকি রং ধুয়ে বের করে ফেলা হয়।

বস্ত্রছাপা ও রংকরণের প্রণালি ভিন্ন হওয়ার কারণে ছাপার কাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় রংকরণের ক্ষেত্রে সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। তবে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়া পুরুর আগে বস্ত্রের মাড় দূর করে, ধুয়ে, ইস্তিক্র করে নিতে হয়।

কাজ – বস্ত্র রংকরণ ও ছাপার পার্থক্য উল্লেখ কর।

প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত মূল উপকরণ হচ্ছে রং। আর রঙের সাহায্যে বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে ব্রক ছাপা, টাইডাই ছাপ ও ব্যাটিক ছাপা উল্লেখযোগ্য।

পাঠ-২-৩ : ব্রক ছাপা

সত্যিকার অর্থে বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে কৌশল বা উপকরণ অবলম্বন করা হয়েছিল তা হচ্ছে ব্রক। অন্যান্য প্রিন্টিং পদ্ধতির পাশাপাশি ব্রক প্রিন্টিং-এর মাধ্যমে আমরা এখনো পরিধানের কাপড়, বিছানার চালর, টেকিল রুখ ইত্যাদি প্রিন্ট করে থাকি এবং আমাদের কুটিরশিল্পে এর জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি।

ব্রক তৈরি – ব্রক প্রিন্টে ব্যবহৃত কাঠের ব্রকগুলো ২-৪ ইঞ্চি বা ৫.০৮-১০.১৬ সে.মি. পুরু হওয়া উচিত। নতুবা এরা টেকসই হবে না। ব্রকের আকৃতি যদিও ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে, তবে লম্বায় ১২-১৬ ইঞ্চি বা ৩০.৪৮-৪০.৬৪ সে.মি. বেশি না হওয়াই ভালো। ব্রক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম (শিরীষ) ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। জাপু, টেডুশ ইত্যাদিও ব্রক প্রিন্টে তাৎক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।



ব্রক তৈরি

ডিজাইনের যে অংশ কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তুলতে হবে, সে অংশ ব্রকের উপরে উঁচু করে রেখে বাকি অংশ গভীরভাবে কেটে ফুলে ফেলতে হবে। এর ফলে কাপড় টেতে যখন ব্রক ছবিতে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হবে, তখন কেবল ডিজাইন যুক্ত অংশেরই রং কাপড়ে ফুটে উঠবে। একই কাপড়ের উপর একাধিক রঙের ডিজাইন ছাপানো যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রঙের জন্য নির্দিষ্ট ব্রকের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় ব্রকের কাজ শুরু করতে হবে।



তৈরিকৃত ব্রক

প্রিন্টিং টেকিল ও কাপার ট্রে প্রস্তুত – ব্রক প্রিন্ট এর জন্য পাথর, সিমেন্ট, লোহা, স্টিল কিংবা ভালো কাঠের তৈরি মজবুত টেকিল হলে সুবিধা হয়। টেকিলের উপর কয়েক প্রস্থ কম্বল বিছিয়ে তার উপর কোরা কাপড় এমনভাবে পিন দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয় যাতে প্রিন্টিংয়ের সময় কাপড় টানটান করে হুড়িয়ে থাকে বা কোনো ভাঁজ সৃষ্টি না হয়। ছাপার রঙের জন্য একটি কাপার ট্রে-এর নিচে রাবার রুখ দিয়ে আটকিয়ে তার উপর মাপমতো ৩-৪ সে.মি. পুরু ফোমের টুকরা বিছিয়ে দিতে হয়। এবার ফোমের উপর এক টুকরা পশমি কাপড় বা চট বিছিয়ে তার উপর রং প্রয়োগ করে ব্রাশের সাহায্যে রং হুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাপা কাজের সময় ব্রকটি পশমি কাপড় বা চটে ২/৩ বার লাগিয়ে প্রকৃত কাপড়ে ছাপ দেওয়া হয়। কাজের শেষে ব্রক ধুয়ে রাখতে হয়।



কাপার ট্রে

২৫ গ্রামসুত (গ্রুসিয়ান) – ব্লক প্রিন্টিংয়ের জন্য বিভিন্ন বয়সের প্রস্তুত ২৫ বালায়ে কিনতে পাওয়া যায়, যা ব্লাকে ভালোভাবে লাগিয়ে কাপড়ের উপর ছাপ দিলেই ছাপ হয়ে যায়। তবে রঙের প্রস্তুত প্রশাশি জনো থাকলে নিজের পছন্দমতো ২৫ তৈরি করে কাপড়ে ছাপ দেওয়া যায়। এখানে গ্রুসিয়ান শেট্ট তৈরি ও ছাপ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

শেট্টের উপকরণ ও শতকরা হিসাব

| | |
|------------------|-----|
| গ্রুসিয়ান ২৫ | ৬% |
| ফুটক পয়স পানি | ২০% |
| ইউরিয়া সার | ৩% |
| খাবার সোডা | ৩% |
| কাপড় কাচার সোডা | ৩% |
| গালাসো গাম | ৬২% |
| ব্রেজিল্ট সল্ট | ১% |
| ট্রিসারিন | ২% |



কাপড়ে প্রিন্ট করা

শেট্ট তৈরি – শেট্ট তৈরির ২৫ ঘণ্টা আগেই বাঁধা দিটার পানিতে ১ তোলা কাইন গাম মিশিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার গায়ে হালকা পয়স পানিতে ২৫ গুলো ইউরিয়া সার, খাবার সোডা, কাপড় কাচার সোডা, ব্রেজিল্ট সল্ট রঙের সাথে মিশিয়ে তৈরিকৃত গামের সাথে একত্র করে মেশাতে হবে (বর্ষাকালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই)।

প্রিন্টিং পদ্ধতি – শেট্ট তৈরি হয়ে গেলে ছাঁকনির সাহায্যে থেকে ট্রিসারিন মিশিয়ে কাপড় প্রিন্ট করতে হবে। এই শেট্ট দিয়ে সলো সলো কাছ করাই উত্তম। কেননা ৫ ঘণ্টা পর এর পুনর্গত মান নষ্ট হয়ে যায়। প্রিন্ট করা হয়ে গেলে ছায়ায় এক-দুইদিন রোলে শুকাতে হবে। গ্রুসিয়ান রঙে ব্লক প্রিন্ট করার পর স্টিম ও বোলাই করতে হয়। স্টিমিং-এর জন্য একটি ইয়াকিতে পানি ফুটতে হবে। এবার ৮ট দিগে কাপড়টি ঢেকে ইয়াকির উপর একটি চালনি বসিয়ে, তার উপর কাপড়টি রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে স্টিমিং করা যেতে পারে।

কাছ – প্রতিকক্ষে একটি টেবিল রূপে ব্লক হাঙ্গা করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কন্ড হাঙ্গার ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তিত্ব কौশল কোনটি:

- | | |
|----------|-------------|
| ক) স্কিন | খ) স্টেনসিল |
| গ) ব্লক | ঘ) রোলার |

২। ব্রক ছাপায় কী কী উপকরণ দরকার?

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ক) ব্রাশ, পেলিল | খ) রং, স্ট্রু ও সূতা |
| গ) রং, প্রিন্টিং টেকিল | ঘ) কাগার ট্রে ও আর্ট পেপার |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমনা তার ঈদের জমাটিতে ব্রক ছাপা করবে বলে ১" পুরু বাকলা কাঠ বাছাই করল। এবং নিম্নের রঙের মিশ্রণ তৈরি করল। এরপর ইচ্ছামতো নকশা করার জন্য কাজ শুরু করল। কিন্তু ছাপার মান আশানুরূপ হলো না।

| | |
|----------------|-------|
| প্রসিয়ান রং | : ৬% |
| ফটস্ট গরম পানি | : ১০% |
| গলানো গাম | : ৬২% |
| খাবার সোড়া | : ৩% |

৩। মিশ্রণটির ত্রুটি কোথায়?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ক) প্রসিয়ান রঙের পরিমাণে | খ) ফটস্ট গরম পানির পরিমাণে |
| গ) গলানো গামের পরিমাণে | ঘ) খাবার সোড়ার পরিমাণে |

৪। ছাপার মান আশানুরূপ না হওয়ার কারণ কী?

- রঙের মিশ্রণে ত্রুটি থাকা
- কাঠ নির্বাচনে ত্রুটি থাকা
- ব্রক তৈরিতে ত্রুটি থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

স্বজনশীল প্রশ্ন

১। তরু কতোগুলো কাপড়ে প্রসিয়ান রঙের ব্রক প্রিন্ট করেই সাথে সাথে কাপড়গুলো বিক্রির জন্য তারা দোকানে নিয়ে আসে। কিন্তু কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ক. কারখানায় প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে কী বলে?

খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. তরুর কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।

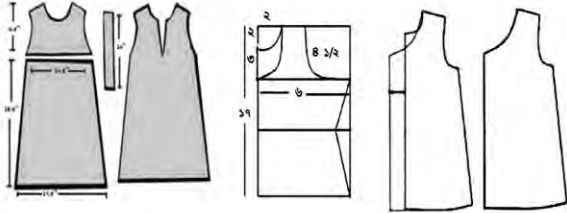
ঘ. ব্যবসায় সাফল্যের জন্য তরুকে আরও সচেতন হতে হবে— স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সস্তদশ অধ্যায়

ড্রাফটিং

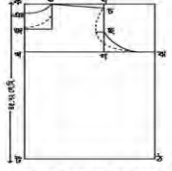
কোনো পোশাক তৈরি করতে গেলে প্রথমে সমতল কাগজে পোশাকের একটি নমুনা আঁকা হয়। একে মূল নকশা বা মূল ড্রাফট বলে। এরপর মূল নকশাকে ভিত্তি করে দেহের মাপ অনুযায়ী সমতল কাগজে যে চূড়ান্ত নকশা আঁকা হয় তাকেই বলে প্যাটার্ন ড্রাফটিং। সফলভাবে প্যাটার্ন ড্রাফটিং তৈরিতে আরাম ও সেলাইয়ের জন্য মূল মাপের সাথে বাড়তি কিছু মাপ যোগ দিতে হয়।

ড্রাফটিং করার অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন – প্রয়োজনে পোশাকের ডিজাইন সহজেই পরিবর্তন করা যায়, একই সাইজের অনেক পোশাক একসাথে ছাঁটা যায়, কাপড়ের অপচয় রোধ করা যায়, পোশাক ছাঁটতে সময় কম লাগে, কাপড়ের বাড়তি ছাঁট বা টুকরা দিয়ে ছোটদের পোশাক ছাড়াও ঘরের প্রয়োজনীয় নানা রকম সামগ্রী– ন্যাপকিন, হুমাশ, টি কোজি, টেবিল ম্যাট ইত্যাদি তৈরি করা যায় এবং মূল ড্রাফটিংয়ের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় নকশার পোশাক সহজে তৈরি করা যায়।



পার্শ্ব ১-৩ শিশুদের পোশাক – ফতুয়ার ড্রাফটিং

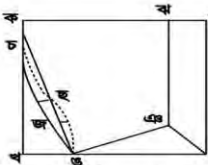
ঘরোয়া বা বাইরের পোশাক রূপে ফতুয়া গ্রীষ্মকালের জন্য বেশ আরামদায়ক। একটি ৩ বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরির জন্য প্রথমেই মূল নকশার পরিকল্পনা করে কাগজে ড্রাফটিং করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়ের জন্য যেসব জিনিস সন্ধান করতে হবে সেগুলো হচ্ছে– বাদামি কাগজ, পেনসিল, স্কেল, পেপকাট, রাবার, গজফিতা, পিন ইত্যাদি। ফতুয়া তৈরিতে ৩ বছরের শিশুর উপযোগী শরীরের বিভিন্ন অংশের মূল মাপগুলো এবং ড্রাফটিং তৈরির পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো।

| <p style="text-align: center;">প্রয়োজনীয় মাপ</p> <p>ঝুগ- ১৭ ইঞ্চি বা ৪৩.১৮ সেন্টিমিটার</p> <p>বুক- ২২ ইঞ্চি বা ৫৫.৮৮ সে.মি.</p> <p>কাফ- ৯ ইঞ্চি বা ২২.৮৬ সেন্টিমিটার</p> <p>হাতার লম্বা- ৩.৫ ইঞ্চি বা ৮.৮৯ সেন্টিমিটার</p> <p>এবং কাফ বা মুহুরী- ৪ ইঞ্চি বা ১০.১৬ সেন্টিমিটার।</p> |  <p style="text-align: center;">কড়ুর সামনের ও পেছনের অংশের দ্রাফটিং</p> |
|---|---|
|---|---|

কড়ুর পেছন ও সামনের অংশের দ্রাফটিং একই সাথে করা হয়। প্রথমে কাঁধের মাপের অর্ধেক বা পুটের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক খ (১১.৪৩+১.২৭=১২.৭ সে.মি.) রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের ১/৪ অংশের মাপ (১৩.৯৭ সে.মি.) নিয়ে ক খ রেখা টানতে হবে। খ বিন্দু হতে বুকের ১/৪ অংশ + ৫.০৮ সে.মি. টিলা + ১.২৭ সে.মি. সেলাই = ২০.৩২ সে.মি. দূরে বা বিন্দু নির্ধারণ করে খ ব যোগ করতে হবে। খ ব রেখার ওপর ক খ গ য় আয়তক্ষেত্র তৈরি হবে।

গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক বিন্দু থেকে বুকের ১/১২ অংশ = ৪.৫৭ সে.মি. দূরে জ বিন্দু শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক বিন্দু হতে ২.৫৪ সে.মি. নিচে ঞ বিন্দু শনাক্ত করে ঞ এর গোলা করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক বিন্দু হতে বুকের ১/৮ অংশ = ৬.৯৮ সে.মি. নিচে ছ বিন্দু শনাক্ত করে ঞ থেকে ছ গোলা করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরও গভীর করা যেতে পারে। অতঃপর ঘ বিন্দু থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ বিন্দু শনাক্ত করে ঞ চ যোগ করতে হবে। বগলের শেপের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু হ শনাক্ত করে হ ব বিন্দু বাঁকা ভাবে যোগ করলে পেছনের বগলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।

সম্পূর্ণ বুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিতে হবে। এখন ক খ রেখাকে ক বিন্দু হতে ৪৫.৭২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ট রেখা আঁকতে হবে। অতঃপর ঝ খ ট ঠ আয়তক্ষেত্র অংকন করতে হবে।

| | |
|---|---|
| <p>হাতার দ্রাফটিং- ক-ঘ = হাতার লম্বা- ৮.৮৯ সে.মি.+</p> <p>মুড়ি- ২.৫৪ সে.মি.+ সেলাই ১.২৭ সে.মি. = ১২.৭ সে.মি.</p> <p>ক-খ = হাতার চওড়া = বুক ১/৪ = ১৩.৯৭ সে.মি.</p> <p>খ-জ = বুক ১/১২+১.২৭ সে.মি.= ৫.৮৪ সে.মি.</p> <p>ঝ-ঘ = মুড়ি ২.৫৪ সে.মি.</p> <p>ঝ-ঞ = কাফ ১/২ + ১.২৭ সে.মি.= ১১.৪৩ সে.মি.</p> <p>ক-চ = ১.২৭ সে.মি.</p> |  <p style="text-align: center;">কড়ুর হাতার দ্রাফটিং</p> |
|---|---|

এবার চ ও ঙ কিন্দু কোনোকোনিতাবে যোগ করতে হবে। এই রেখার মধ্যকিন্দু হ। হ কিন্দুর ১.২৭ সে.মি.বাইরে একটি কিন্দু দিয়ে ও থেকে চ পর্যন্ত শেইপ করতে হবে। হাতার সামনের অংশের শেইপ করার জন্য এবার হ ও ঙ-এর মধ্যকিন্দু জ নিয়ে, জ এর ০.৬৩৫ সে.মি. তেতরে একটি কিন্দু শনাক্ত করে ও হ চ এর সাথে চিত্রের মতো শেইপ করতে হবে।

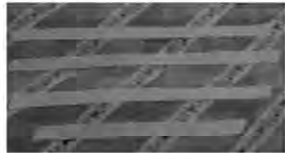
কাঁজ – একটি ফতুয়ার সামনের অংশ, পেছনের অংশ ও হাতার ড্রাকটিং প্রস্তুত কর।

ফতুয়া প্রস্তুত – ড্রাকটিং অনুসারে ফতুয়া প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে পরিকল্পনা অনুসারে কাপড়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ছেঁটে সেলাই করতে হবে। একটি ও বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরির জন্য ১ গজ কাপড় এবং সেলাইয়ের জন্য সুতা, সূঁচ, বোতাম, কাঁচি, সেলাই মেশিন ইত্যাদি হাতের কাছে রাখতে হবে।

কাপড় ছাঁটাই – কাপড়কে সঠিক পদ্ধতিতে ভাঁজ করে তার উপর ড্রাকটিংয়ের কাপজ রেখে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাপড় ছাঁটতে হবে। ছাঁটার পর পেছনের অংশ আলাদা করে, সামনের অংশের কাঁধের শেইপ ও গলা ছেঁটে গলার মধ্যকিন্দু থেকে ৭.৬২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত ছাঁটতে হবে।

পাশের কাপড়কে পুনরায় ভাঁজ করে হাতার ড্রাকটিং ফেলে একসাথে ছাঁটতে হবে। এবার হাতার ড্রাকটিংয়ের সামনের অংশের শেইপ করে, দুই হাতার সামনের অংশের কাপড় একসাথে করে, পুনরায় ড্রাকটিং ফেলে সামনের অংশের হাতার শেইপ ছাঁটতে হবে।

এবার টুকরা কাপড় দিয়ে গলার পাইপিং এবং বোতামের পট্রি তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিপরীত রঙের কাপড়ও ব্যবহার করা যায়।



পাইপিং তৈরির পদ্ধতি

সেলাই – প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর বোতামের জন্য পট্রির ব্যবস্থা করে গলার পাইপিং লাগাতে হবে। তারপর দুইপাশ সেলাই করে, ঝুল পরীক্ষা করে নিচের কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে টাক সেলাই দিতে হবে।

হাতা দুটো আলাদাভাবে সেলাই করে বডির সাথে সংযোজন করতে হবে। এবার কিটিং পরীক্ষা করে নিচে হেম সেলাই দিয়ে, হুকের সামনে লুপ ও বোতাম লাগাতে হবে। সবশেষে অতিরিক্ত সুতা কেটে, ইস্ত্রি করে ফতুয়া সেলাই শেষ করতে হবে।



তৈরিকৃত ফতুয়া

কাঁজ – ড্রাকটিং অনুসারে একটি ফতুয়া তৈরি কর।

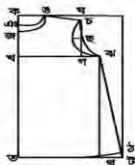
পাঠ-৪-৫ : বেবি ফ্রকের ড্রাকটিং

বেবি ফ্রক হচ্ছে শিশুর উপযোগী পোশাক। এই পোশাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- এ লাইন শেইপ ফ্রক, ইয়োক ফ্রক, টিউনিক ইত্যাদি। এখানে ৩ বছরের শিশুর উপযোগী এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাকটিং তৈরি করতে শরীরের যেসব অংশের মাপ নিতে হয়, সেসব অংশের মূল মাপ এবং ড্রাকটিংয়ের পদ্ধতি নিচে ভুলে ধরা হলো-

প্রয়োজনীয় মাপ
খুল - ৪৫.৭২ সেন্টিমিটার
বুক - ৫৫.৮৮ সে.মি. এবং
পুট - ১১.৪৩ সেন্টিমিটার।

ড্রাকটিংয়ের জন্য বাদামি কাপড়, পেনসিল, স্কেল, শেইপকাট, রাবার, গজ, পিন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পেছন ও সামনের অংশের ড্রাকটিং একই সাথে করা হয়।

প্রথমে পুটের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক খ রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের ১/৪ অংশের সাথে ২.৫৪ সে.মি. যোগ করে ক খ রেখা টানতে হবে। খ কি দুই হতে বুকের ১/৪ অংশের সাথে টিলা এর জন্য ৬.৩৫ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ২১.৫৯ সে.মি. (১৩.৯৭ সে.মি. + ৬.৩৫ সে.মি. + ১.২৭ সে.মি.) দূরে ঝ কি দুই নির্ধারণ করতে হবে। এবার খ ব যোগ করে খ ব রেখার উপর ক খ গ য আয়তক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ খুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিয়ে (৪৫.৭২+ ১.২৭+১.২৭) ক খ রেখাকে ক কি দুই হতে ৪৮.২৬ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ত রেখা আঁকতে হবে। এবার ঝ ব ত ঘ আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করতে হবে। ঘেরের জন্য ঘ কি দুই থেকে প্রায় ৪ সে.মি. দূরে ট কি দুই দিয়ে ব ত যোগ করে শেইপকাট দিয়ে সুন্দরভাবে চিত্রের ন্যায় ঝ রেখা বরাবর শেইপ করতে হবে। গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক কি দুই থেকে বুকের ১/১২ অংশ = ৪.৬ সে.মি. দূরে ঙ কি দুই শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক কি দুই হতে ১.২৭ সে.মি. নিচে ঞ কি দুই শনাক্ত করে ঙ ঞ গোল করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক কি দুই হতে বুকের ১/৮ অংশ নিচে জ কি দুই শনাক্ত করে ঙ থেকে জ গোল করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরো গভীর করা যেতে পারে। এরপর ঘ কি দুই থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ কি দুই শনাক্ত করে ঙ চ যোগ করতে হবে। কাঁলের শেষের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু হ শনাক্ত করে হ ঝ কি দুই বীকা ভাবে যোগ করলে পেছনের কাঁলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।



বেবি ফ্রকের ড্রাকটিং

কাঁজ - ৩ বছরের একটি শিশুর শরীরের মাপ দিয়ে একটি এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাকটিং তৈরি কর।

কাপড় ইটি ও সেলাই- উপরোক্ত ড্রাকটিং অনুসারে বেবি ফ্রক ইটার জন্য ৯১.৪৪ সে.মি. চওড়া ও ৫০.৮ সে.মি. দৈর্ঘ্য কাপড়কে ভাঁজ করে তার উপর ড্রাকটিংয়ের কাপড় রেখে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাপড় ইটিতে হবে। পাশের টুকরা কাপড় দিয়ে গলা ও কাঁলের পাইপিং এবং বোতাম পড়ি তৈরি করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পিঠ সম্পূর্ণ খোলা বা অর্ধেক খোলা থাকতে পারে।

সেলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর গলা ও কাঁলের পাইপিং লাগিয়ে বোতাম পড়ি সেলাই করতে হবে। অনেক সময় দুই কাঁধেও বোতামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দুই পাশ সেলাই করে, খুল পরীক্ষা করে নিচের কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে টাক

সেলাই দিতে হবে। কিটিং পরীক্ষা করে নিচে হেম সেলাই দিয়ে, প্রয়োজনীয় বোতাম লাগাতে হবে। সবশেষে অতিরিক্ত সুতা কেটে, ইন্সট্র করে ফ্রকের সেলাই শেষ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক) শার্ট | খ) ফতুয়া |
| গ) পাঞ্জাবি | ঘ) সাফারি |

২। ড্রাফটিং করলে সুবিধা হয় কেন?

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ক) কাপড়টি সংকুচিত হয় না | খ) দেহের ফিটিং ভালো হয় |
| গ) সেলাই মজবুত হয় | ঘ) ভিজাইন ভালো করা যায় |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুগেখা তার কামুর মেয়ের জন্মদিনে বৈবিক্তক দিবে বলে মন স্থির করে। সে কাপড় কেটে সেলাই করে। সেলাইয়ের পর কাপড়টি ইস্ত্র করতে গেলে দেখে সেলাই উটোপাল্টা হয়েছে।

৩। জুগেখা প্রথমেই কাপড়ে কোন অংশ সেলাই করলে কাপড়টি উটোপাল্টা হতো না?

- | | |
|------------------------|---|
| ক) গলায় পাইপিং লাগালে | খ) নিচের অংশ জোড়া দিলে |
| গ) নিচ সেলাই করলে | ঘ) ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশের কাঁধ একত্রে |

সেলাই করলে

৪। জুগেখার তৈরি ফ্রকটি সঠিকভাবে তৈরি করার জন্য করণীয় ছিল—

- ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশ একসাথে ছাঁটা
- সেলাইয়ের সঠিক ধাপ অনুসরণ করা
- কাপড় কেনার সময় কম কাপড় না কেনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। প্রশিক্ষণের পর রোজিনা প্রথম ৩০ তিন বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরি করার জন্য কাপড় কিনে। সে শিশুটির কীধের মাপের $\frac{1}{2}$ অংশ, ফ্রকের মাপের $\frac{1}{2}$ অংশ মাপ নেয় এবং কাপড়টি কেটে ফেলে। পোশাকটি তৈরি করার পর শিশুটির গায়ে দিতে গেলে দেখে জামাটি ৩০ গায়ে ঢুকছে না। সে জামাটি পরিবর্তন করতে চাইলে কোনোভাবেই তা করতে পারে না।

ক. কোন ধরনের কাগজে পোশাকের নমুনা আঁকা হয়?

খ. প্যাটার্ন ড্রাফটিং বলতে কী বোঝায়?

গ. রোজিনা শিশুর পোশাকটি উপযোগী করে কীভাবে তৈরি করতে পারত। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভূমি কি মনে কর পোশাকটি তৈরিতে রোজিনার কোনো ত্রুটি ছিল? বিশ্লেষণ কর।

অষ্টদশ অধ্যায় পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা

পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। নিম্নের পছন্দমতো পোশাক শুধু ক্রয় করলেই চলে না। বরং পোশাকের কর্মউপযোগী ও টেকসই রাখতে হলে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাক ও পুরানো ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন পুরানো বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাকে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। অনেক সময় পোশাকে দাগ বেগে পোশাকটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এই ধরনের ক্ষতি কমানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাকের দাগ উঠিয়ে ফেলা উচিত।

পোশাকের স্মারিত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

পাঠ-১ : বস্ত্র ধৌতকরণ

পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো বস্ত্র ধৌতকরণ। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো—

- কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করা।
- পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

নিম্নে বস্ত্র পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হলো

| পরিষ্কারক দ্রব্য | আনুষঙ্গিক দ্রব্য |
|---|--|
| সাবান : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। বাড়ির বেশির ভাগ কাপড়ই সাবান দিয়ে কাটা হয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সাবান পাওয়া যায়। সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে সেই সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য উপযোগী নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কয়েকটা গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন— সাবান দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না; সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না; সাবানের গা মসৃণ হবে; সাবান পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও তিজানোর ক্ষমতা বাড়ায়; সাবান কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে; পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে উঠে। | বোরাক্স : বোরাক্স নামের এই পরিষ্কারক দ্রব্যটি আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বর্তমানে সোডিয়াম, কার্বন, বরিক এসিড ইত্যেও কিছু কিছু পরিমাণ বোরাক্স তৈরি করা হচ্ছে। বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় তাই কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঊজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দ্রব্যটি অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতেও ব্যবহার করা হয়। |

| | |
|---|--|
| <p>কাপড় কাচা সোভা : কাপড় কাচার সোভাকে সোভিয়াম কার্বনেট বলে। বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সোভা দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়। বেশি ময়লা এবং তৈলাক্ত সূতি ও শিনেন কাপড় সিদ্ধ করা, জীবাণু মুক্ত করা ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোভা ব্যবহার করা হয়। তবে সবচেয়ে কাপড়ে সোভা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সোভার অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রভাবে রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।</p> | <p>স্টার্চ : চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। স্টার্চ ব্যবহারের ফলে কাপড় সহজে ময়লা হয় না।</p> |
| <p>গুঁড়া সাবান : বর্তমানে আমাদের দেশে গুঁড়া সাবানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পায়ে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। বাজারে বিভিন্ন নামে গুঁড়া সাবান পাওয়া যায়। এইসব গুঁড়া সাবানে বার জাতীয় উপাদান থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয়।</p> | <p>নীল : কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়, একমাত্র নীল ব্যবহারের ফলে হলদে ভাব কেটে নীলাভ সূতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য অল্ট্রামেরাইন (Aeltramarine), প্রুশিয়ান (Prussian) এবং ইনডিগো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নীল তরল ও পাউডার দুইভাবেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।</p> |
| <p>তুকের জল : তুকের জলকেও পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তুকের জল দিয়ে সিনটজ এবং ক্রিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুকে জ্বলিও বলা হয়। তুকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে বখন পানি বাষ্পি বৃষ্টি ধারণ করবে তখনই তুকের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।</p> | <p>কাপড় মোলায়েমকরক : সিনথেটিক কাপড়ের জামাকাপড় কিছুদিন ব্যবহার করার পর একটু দৃঢ় প্রকৃতির হয়ে যায়। কাপড় মোলায়েমকরক ব্যবহার করলে কাপড় নরম ও কোমল থাকে। তবে বেশি ব্যবহার করলে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।</p> |
| <p>অ্যামোনিয়া : এটা এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য খর পানি এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হয়। রঙিন বস্ত্রাদি এই প্রকার মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কখনো কখনো কাপড়ের দাগ উঠানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়।</p> | <p>জীবাণুনাশক : কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে ধোয়া হয়। যেমন : ক্লোরিন, ব্লিচিং।</p> |
| <p>রিটা : প্রাচীনকাল থেকেই এই রিটা ফল রেশম, পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রিটার বোসার মধ্যে স্যাগোনিম নামে একটা দর্পা আছে এই স্যাগোনিমই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায় ও রং ভালো থাকে।</p> | <p>তিনিগার : বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য তিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য তিনিগার মিশিয়ে গুঁই পানিতে কিছুকণ রাখলে রং ফিরে আসে।</p> |
| <p>সিনথেটিক ডিটারজেন্ট : ডিটারজেন্ট এক ধরনের বারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।</p> | <p>লবণ : নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ ডুকাতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।</p> |

কাঁজ - গৃহে ব্যবহৃত পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

‘বস্ত্র ধৌতকরণ’ পরিবারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কেননা প্রতিদিনই ব্যবহার্য কাপড় পরিষ্কার করতে হয়। আবার কখনো কখনো সাম্প্রতিক কিংবা মৌসুম ভিত্তিক ধৌতকরণ প্রক্রিয়া চলে। কাপড় ধোয়া পরিশ্রমের কাজ। এই কাজটি সুছঁতাৰে শেষ করার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন,

ময়লা কাপড় বাছাই করা-

পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তরতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়।

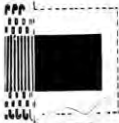
আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড়ে যেমন, সূতি, সিনেন, রেশম, নাইলন, টেটন ইত্যাদি) একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। বাছাইকরণের সময় যেসব কাপড়ের প্রকৃতি এবং ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সেগুলো সব এক সাথে রাখা উচিত। কাজেই বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে তন্তু, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্র বাছাই করতে হবে। কাপড়ে বা পোশাকের গায়ে যদি কোনো নির্দেশনা থাকে তবে তা অনুসরণ করা উচিত।

মেরামত করা-

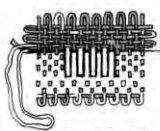
ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বোতাম, হুক, বকলেন ইত্যাদি টিলা কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো আলাক্যিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে তা খুলে রাখতে হবে।

মেরামতের নমুনা

ক) রিফু করা : পোশাকের কোনো স্থানে বোঁচা গেলে ছিঁড়ে গেলে বা কেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সূতা সূঁচ ও নিপুণভাবে সূচের সাহায্যে ভরে দেওয়ারকে রিফু করা হয়। এজন্য বস্ত্রের সূতা অনুযায়ী সূচ ও সূতার প্রয়োজন। তা ছাড়া রিফু করার সূতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়। রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেনসিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে রান ফৌড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সূতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সূতার ভেতর দিয়ে সূচ দিয়ে প্রথমে টানা সূতার (Warp yarn) অংশ পরিপূরণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণতা টানা সূতার ভরে ভুলে একই পদ্ধতিতে ভরা সূতার (Filling yarn) অংশের একটা সূতার উপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেম ব্যবহার করলে সুবিধা হয়।



রিফু প্রথম পর্যায়



রিফু দ্বিতীয় পর্যায়

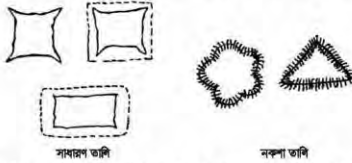


রিফু তৃতীয় পর্যায়

খ) তালি দেওয়া : বস্ত্র ও পোশাকের কোনো অংশ ছিঁড়ে গেলে এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকেই তালি দেওয়া বলা হয়। পোশাক পরিচ্ছেদের কোনো অংশ ছিঁদ্র হলে, পুড়ে গেলে বা পোকার কটিলে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তালি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

(i) সাধারণ তালি : তালি গোলাকার বা চারকোনাকার হতে পারে। যে কাপড়ে তালি দেওয়া হবে তার অনুরূপ রং ও জমিনের বড় এককণ্ড কাপড় নিতে হবে। তালির কাপড় ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা বড় হবে। টুকরা কাপড়টি তালি দেওয়ার আগে ভালোভাবে ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। যে কাপড়টি দিয়ে তালি দিতে হবে সে কাপড়ের টুকরা ছেঁড়া জায়গায় বসিয়ে ধার মুড়ে চারদিকে হেম ফাঁড় দিয়ে কাপড়ের সাথে আটকাতে হবে। এবার কাপড়টাকে উল্টো করে ছেঁড়া জায়গাটা কোনোকুনি কেটে মুড়ে টুকরা কাপড়ের সাথে হেম ফাঁড় দিয়ে সেলাই করে দুই পাশে ইস্ত্রি করে বসাতে হবে।

(ii) নকশা তালি : সাধারণ তালির জন্য কাপড়ের রঙের তালির কাপড় পাওয়া না গেলে অথবা তালি দিলে দেখতে খারাপ লাগবে মনে হলে অথবা ব্যবহৃত কাপড়টি এতই নতুন যে সৌন্দর্য নষ্ট করতে মন চাচ্ছে না, এখানে অনেক দিন ব্যবহার করতে হবে— এমন অবস্থায় নকশা তালির মাধ্যমে মেরামত করা যায়। একেদ্রে ছেঁড়া কাপড়ের উপর অন্য রঙের কাপড় দিয়ে নকশা করে কেটে প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে পরে বোতাম ফাঁড় দিয়ে সেলাই করতে হবে। উল্টা দিকের ছেঁড়া কাপড় সাধারণ তালির মতো সেলাই করতে হবে। যাতে সুতা বের হতে না পারে। এই নকশা তালির মতো আরও নকশা করে সমস্ত কাপড়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরও নকশা বসিয়ে নিলে তালি দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝা যায় না। অনেকটা এট্রিক নকশার মতো দেখায়। ছেলেদের প্যাট, শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে বড় স্টিকার ব্যবহার করা যায়।



দাগ অপসারণ— নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লাগে এবং ব্যবহারের অনুরূপ হয়। দেখতেও খারাপ লাগে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগযুক্ত স্থানটির দাগের উৎস, তত্ত্ব প্রকৃতি জানতে হবে। কেননা রং অন্যান্য পরিস্কারক দ্রব্যের সল্ফোর্গ এসে দাগটি স্থায়ীভাবে বসে যেতে পারে।

বস্ত্র পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন— বস্ত্র যৌতকরণের আগেই বস্ত্রের তত্ত্ব প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার-আয়তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সন্ধান করে নিতে হবে। বস্ত্র অনুযায়ী গরম বা ঈষদুষ্ণ পানি কিংবা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। আবার কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন: সুতি ও শিনেন কাপড়ে সাধারণ সাবান ও ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু রেশমি ও পশমি বস্ত্র ডিটারজেন্ট পাউডার এবং ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ধুতে হয়। সাবান মাখানোর পর গ্রায় অধঃস্থার মতো রেখে দিলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয় এবং কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়।

পানিতে ভেজানো— বেশি ময়লা কাপড় (মশারি, পর্দা, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি) সাবান পানিতে দেওয়ার আগে ঠান্ডা বা ঈষদুষ্ণ পানিতে আধঘণ্টা বা একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের ময়লা আলাগ হয়। এরপর সাবান পানি দিয়ে ধুলে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় এবং সাবানও কম খরচ হয়।

কাপড় কাচা— সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর জামাকাপড়ের বেশি ময়লা অংশগুলো ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। শার্টের কলার, হাতা, কাফ, প্যান্টের পেছনের অংশ, পাজামা—পেটিকোটের বুকের প্রান্ত প্রভৃতি স্থান বেশি ময়লা হয়। এ জন্য সম্পূর্ণ কাপড়টি কাচার আগে এই অংশগুলো একটু বেশি করে সাবান দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। প্রয়োজনে নরম ব্রাশ ব্যবহার করা যায়। এরপর সম্পূর্ণ কাপড় অল্প অল্প পানি দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে ধুতে হয়। তবে রেশমি কাপড় না কেচে দুহাতে চাপ দিয়ে ধুতে হয়— রগড়ানো ঠিক নয়। এতে কাপড়ের কোমল আঁশের ক্ষতি হয়।

প্রকাশন— কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার পর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়তে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রকাশন বলা হয়।

এরপর কাপড় নিখুঁত পানি বের করতে হয়। রেশমি কাপড়ের পানি নিষ্কাশনের সময় না মুচড়িয়ে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। ধোয়া পশমি কাপড় মোটা তোয়ালে মধ্যে জড়িয়ে চাপ দিয়ে পানি শোষণ করাতে হবে। রেশমি ও পশমি কাপড় শেষবার ধোয়ার সময় পানিতে সামান্য পরিমাণ তিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

নীল ও মাড় প্রয়োগ— সাধারণত সূতি ও গিনেনের কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কতোটা ঘন মাড় দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কাপড়ের প্রকৃতির উপর। মোটা কাপড়ে পাতলা মাড় দেওয়া হয়। সাদা কাপড়ে নীল প্রয়োগ করা হয়। যখন কাপড়ে নীল ও মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন মাড়ের মতো নীল গুলে নেওয়া হয়। ধোয়া কাপড় নীল মেশানো মাড়ে ডুবিয়ে নিখুঁত নিয়ে রোদে শুকাতে হয়। এভাবে সূতি সাদা কাপড় এবং গাঢ় রঙের (নীল/কাল) কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

কাপড় শুকানো— কাপড় ধোয়ার পর ঠিকভাবে না শুকালে কাপড়ের ধবধবে এবং কড়কড়ে ভাবটা আসে না। মেটমেটে ভাব এবং স্যাঁতসৈতে গন্ধ হতে পারে। সাদা কাপড় রোদে শুকালে আরও সাদা হয়ে উঠে। রঙিন কাপড়, রেশমি কাপড় ছায়ায় শুকানো ভালো। পশমি কাপড় বাতাসপূর্ণ খোলামেলা ছায়ামুক্ত কোনো সমতল জায়গায় বিছিয়ে শুকাতে হয়। কাপড় বা পোশাকের ভারী মজবুত অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়।

ইস্টির করা— ধোয়ার পর প্রায় সব কাপড়েই কুঞ্জন সৃষ্টি হয়। কাপড় মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য ইস্টির করা হয়। ইস্টির করার আগে মাড় দেওয়া সূতি কাপড়গুলো সামান্য পানি ছিটিয়ে নরম করে নিতে হয়। কাপড়ের প্রকৃতি অনুসারে ইস্টির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন : রেশম ও কৃত্রিম তন্তুর কাপড় সর্বনিম্ন তাপে, পশম ৩০০°F তাপে, সূতি ৪০০°-৪৫০°F তাপে, লিনেন ৪৭৫°-৫০০°F তাপে ইস্টির করা হয়।

হাওয়া লাগানো— ইস্টির করার পর বস্ত্রাদিতে অর্ধ্ণতা থাকে। এই অবস্থায় বস্ত্র বা আলমারিতে রাখা ঠিক নয়। সেজন্য কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রেখে অর্ধ্ণতা দূর করতে হয়। কাপড় শুকালে যথাস্থানে সঞ্জন করতে হয়।

পাঠ-৩: রেশমি বস্ত্র যৌতকরণ

রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ফর ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে।

এই ধরনের বস্ত্র ধৌতকরণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

- ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং উঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধুশে সাদা বস্ত্রের রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা ধোয়া উচিত।
- সব সময় রেশমি বস্ত্রে মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ডিজারজেন্ট হিসাবে রিঠা, ভালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের যে কোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়ে-চেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।
- ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বাগতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়ে-চেড়ে নিতে হয়। রঙিন কাপড়ের বোয়াল শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠান্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। হাত দিয়ে চেপে পানি বের করতে হয়।
- অনেকবার ধোয়া হয়েছে এমন রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য এরাহুটের দ্বারা তৈরি মাড় প্রয়োগ করা হয়। গাঁদও রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
- রেশমি বস্ত্র সব সময় ছায়ায় শুকাতো হয়। সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।
- রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। সূতি কাপড়ের মতো রেশমি বস্ত্রে পানি ছিটানো বা স্প্রে করতে হয় না। এতে কাপড়ে পানির ফোঁটার দাগ বসে যায়। রেশমি কাপড় ইস্টা পিঠে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করলে উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। ইস্ত্রি শেষে কাপড়ের জলীয় বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ—

পশমি কাপড় প্রাণিজ তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়। পানি, উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ পশম তন্তুকে দুর্বল করে। এ জন্য পশমি কাপড় ধোয়ার সময় ঈষদুষ্ণ পানি, কম ক্ষারযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয়।

ধোয়ার পদ্ধতি—

- পশমি কাপড় চোপড় ধোয়ার আগে প্রয়োজন অনুসারে মেরামত, দাগ অপসারণের কাজটি করে নিতে হয়। সাদা ও রঙিন কাপড়গুলো ভাগ করতে হয় কারণ এগুলো আলাদা ধোয়া উচিত। তারপর কাপড়গুলো হালকাভাবে ত্রাশ করে আলগা ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হয়। হাতে বোনা পশমের জামাকাপড় বেশ নমনীয় প্রকৃতির হয়। ধোয়ার পর এগুলির আকৃতি প্রায়ই ঠিক থাকে না। এ জন্য ধোয়ার আগে এসব পোশাকের আকৃতি বা নকশা একটা কাগজের উপর ঠেকে রাখতে হয়। ধোয়ার পর ওই নকশা আঁকা কাগজের উপর পোশাক রেখে হাত দিয়ে টেনে আকৃতি ঠিক করে নেওয়া যায়।



পশমি কাপড় ধোয়ার আগে নকশা অঙ্কন

- পশমি কাপড় ধোয়ার কাজে ঈষদুষ্ক পানি ব্যবহার করতে হয়। কম ক্ষরযুক্ত গুঁড়া সাবান যেমন: ছোট পাউডার ইত্যাদি পশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য উপযোণী। একটা বড় গামলায় ঈষদুষ্ক পানিতে সাবান খুলে কাপড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর দুই হাত দিয়ে ধরে এপিঠ-ওপিঠ করে সাবান লাগাতে হয়। পশমি কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ জন্য বেশিক্ষণ সাবান মাখিয়ে রাখা ঠিক নয়।
- সাবান লাগাবার পর দুই হাত দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে নেড়েচেড়ে এপিঠ-ওপিঠ করে কেতে পরিষ্কার করতে হয়। মাঝে মাঝে পানি দিয়ে নিতে হয়।
- কাপড়ের ময়লা ভালোভাবে দূর হওয়ার পর সাবান ও ময়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন পানি দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে ছাড়াতে হয়। তিন-চারবার ঈষদুষ্ক পানি দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া উচিত। একই সাথে একাধিক পাত্রে একই তাপমাত্রার পানি রাখলে কাপড় ধোয়ার কাজ সহজ ও দ্রুত হয়। পশমের সাদা জামাকাপড় শেববার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। রঙিন পশমি কাপড় ধোয়ার সময় পানিতে ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের রং ভালো থাকে। ধোয়ার পর একটি মোটা বড় পরিষ্কার তোয়ালের মধ্যে ভেজা কাপড়টিকে জড়িয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। কাপড় কখনই মুচড়িয়ে নিগড়াতে হয় না। এতে কাপড়ের ক্ষতি হয়।
- পশমি বস্ত্র মৃদু সূর্য কিরণ অথবা আলো বাতাসপূর্ণ ছায়ায় স্থানে শুকাতে হয়। বেশি তৈরি পশমি বস্ত্র সমতল স্থানে পাটি, মানুর, কাঁধা প্রভৃতি মেলে তার ওপর ভেজা কাপড়গুলো বিছিয়ে শুকাতে হয়। মাঝে মাঝে কাপড়গুলো এপিঠ-ওপিঠ করে নেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।
- পশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় উল্টা দিক দিয়ে মৃদু তাপে এবং হালকা চাপে ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রি করার সময় একটা পাতলা ভেজা কাপড় উপরে বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ইস্ত্রি চালাতে হয়। এতে তন্তুর ক্ষতি হয় না এবং উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। কাপড় ইস্ত্রি করার পর কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে উত্তমরূপে জমীর বাস্প দূর করে নিতে হয়। তারপর স্বাভাবিক সন্নিবেশ করতে হয়।

পার্শ্ব-৪: শুম্ভক দৌতকরণ

পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক প্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুম্ভক দৌতকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাবার আশঙ্কা থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

ব্যবহৃত উপকরণ : শূক্ষ্ম ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। আর তাতে কিছুটা পানি থাকলেও তা ভুলা বা কোনো প্রকার শোধক দিয়ে পানিশূন্য করা হয়। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

উপকরণের যে সব বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন তা হলো—

- শূক্ষ্ম ধোলাইয়ে ব্যবহৃত তরলের কারণে যেন বস্ত্র গন্ধ তৈরি না হয়।
- কিছু তরল আছে যা বেশি উদারী—বাতাসে সহজে উড়ে যায় এবং এর ফলে ধোলাইয়ে বেশি ঋচ হয়। আবার কিছু তরল পদার্থ আছে কম উদারী—এতে কাপড় দেরিতে শুকায়। সে কারণে মাঝামাঝি উদারী তরলই শূক্ষ্ম ধোলাইয়ের জন্য উত্তম। তবে দুই বা ততোধিক তরলের মিশ্রিত দ্রাবকে শূক্ষ্ম ধোলাই ভালো হয়।
- শূক্ষ্ম ধৌতিতে ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রল উল্লেখযোগ্য। এসব কয়টি পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যে পেট্রলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

ধোয়ার নিয়ম : শূক্ষ্ম ধৌতকরণের বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ

- প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা খেঁড়ে ফেলাতে হয়।
- পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়।
- পরপর চারটি পাত্রে ওই পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়।

প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিপাল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রগড়িয়ে তুলতে হয়।

- তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা তিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম।
- এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সজ্ঞকণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বকারে এনে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না।
- কাপড়টি এভাবে শুকানোর পর এর উপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

শূক্ষ্ম ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন—কাপড় ধোয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার—

- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন আগুন না থাকে
 - কাপড় ধোয়ার তরল যেন মেঝেতে না পড়ে। এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র শূক্ষ্ম উপায়ে বাড়িতেও ধোয়া যায়।
- নাইলন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি : এসব সিনথেটিক তন্তুর বস্ত্রাদি পানিতে ডিঙ্কিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না। বেশি ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ক সাবান জলে ডিঙ্কিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। ভালো সাবানের গুঁড়া, বার ব্যবহার করা যায়। ধোয়ার সময় কখনো মোচড়াতে হয় না। আস্তে ধুপে ধুপে ধুতে হয়। পরিষ্কার পানি একাধিকবার ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। তারপর ছায়ায় শুকাতে দড়িতে টানিয়ে শুকাতে হয়। এই তন্তুর বস্ত্রগুলি ধৌতকরণের ফলে তেমন কখন পড়ে না বলে ইস্ত্রি না করলেও চলে।

কাছ – বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

পাঠ-৫: সজ্জকণ

সজ্জকণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। এখানে ব্যবহৃত বস্তুাদি খোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। আমরা নানা ধরনের কাপড়চোপড় ব্যবহার করি। এদের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক অন্তর্গত। এ ছাড়া প্রায় সব বাড়িতে বিছানাপত্র এবং গৃহসজ্জার নানা টেকিল রুথ, কুশন কভার, ন্যাপকিন, ট্রে ক্লথ ইত্যাদি থাকে। এগুলোর উচ্ছলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সজ্জকণ করতে হয়। সজ্জকণ একক হিসেবে স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বক্স, সুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

কাপড় সজ্জকণের লক্ষণীয় বিষয় :

- দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।
- বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সজ্জকণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপখলিন দিতে হয়।
- শেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শূকনা চা পাতা কাপড়ের পুটিপিতে বৈধ রেখে দেওয়া যায়। নিমপাতাও রাখা ভালো।
- মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্য়াতসৈতে ভাব দূর হয়।
- শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময়ে পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বছরের ২-৩ মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বছরের বাকি সময় এগুলো তোলাই থাকে। পশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। সঠিক উপায়ে সজ্জকণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত টেকে।

সজ্জকণের উপায়গুলো নিম্নরূপ-

- পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথ পোকের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সজ্জকণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- এরপর ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে অর্ধতামুক করে নিতে হয়। তারপর ভাগে ভাগে আলমারি বা বজের মধ্যে ভরে রাখতে হয়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপখলিন দিতে হবে। এ ছাড়া শূকনো নিমপাতা, তামাক পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়।
- সজ্জকণ করার আগে আলমারি বা বক্সে কীটনাশক স্প্রে করে নিলে ভালো হয়।
- সজ্জকণ কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে মেলে বাতাসে লাগিয়ে স্য়াতসৈতে ভাব দূর করতে হয়।
- পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারির ভেতর হ্যাণ্ডারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।
- রেশমি বস্ত্র মৃণাল হয়ে থাকে। এসব বস্ত্র ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য বজের সাথে সজ্জকণ করতে হয়।

সজ্জকণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- সজ্জকণ করার আগেই নিয়মানুযায়ী ধৌতকরণ, শূকনো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে।
- ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রের জলীয়বাষ্প উত্তমরূপে দূরীভূত করতে হবে। তা না হলে ফালাস সৃষ্টি হয়ে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়।

- রেশম কাপড়ের চরম শত্রু কাপড় কাটার হুপালি পোকা। তাই অবশ্যই সংরক্ষিত স্থানটি অর্ধুতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে হালকা রোদে বাতাস চালনা করে শুকিয়ে নিতে হবে।

কাছ – বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্কতামূলক বিষয় সম্পর্কে লেখ।

পাঠ-৬: পরিপাটিতা ও দৈনিক পরিচ্ছন্নতা

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ জন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পরিপাটি বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছন্ন ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ দেহেই সুস্থ মন থাকে। সুস্থ্য মনই শৈল্পিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে।

পরিপাটি বজায় রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

- পরিপাটিয়ের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন।
- সমরোপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পরিপাটিয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন, চুল, চোখ, দাঁত, নখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।
- দেহে সৌষ্ঠবের ভঙ্গিতে ঋজুতা ও সাবলীলতা এবং কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।
- অনুষ্ঠান, উপশব্দ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। সব ধরনের ডিজাইন, সব টাইপের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।
- পরিপাটি হওয়ার জন্য দামি পোশাকের প্রয়োজন নেই। অত্যাধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়।
- সাধারণ পোশাকের সাথে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সূক্ষ্মমন্ডল ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠা যায়।
- সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। যেমন— একজন বাঙালি মেয়েকে শাড়িতেই সুন্দর লাগে।
- পোশাকে শিল্পের সৃষ্টির উপকরণ ও নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটালে পরলে পরিধানকারী আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে রং, রেখা ও জমিনের মিল পরিপাটি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ যেমন— শাড়ির সাথে উপযুক্ত ব্লাউজ, সাপোয়ার-কামিজের সাথে উপযুক্ত ওড়নার ব্যবহার মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।
- পোশাকের সাথে জুতা, হাতবাগ, গহনা এবং মেকআপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপরিপাটির অন্যতম শর্ত। যেমন, শাড়ির সাথে কেডস মানানসই নয়। একইভাবে স্কুলের পোশাকের সাথে উঁচু হিল পরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্কুলের মেয়েদের লিপস্টিক, কাকল, গহনা ইত্যাদির ব্যবহার পরিপাটির পরিপন্থী। অর্থাৎ পরিপাটিয়ের জন্য পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

দৈনিক পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত যথা: হাত, পা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার

সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক ছড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে উঠে। নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে কোনো সতর্কতা থাকে না।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো—

ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা—

হাতের যত্ন : ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে হাত। মসৃণ ও সুডোল হাত সৌন্দর্য ও সুস্থতা প্রকাশ করে। হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো—

- কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করতে হবে।
- হাতে বিভিন্ন তরকারির কষের দাগ কিংবা রান্নার মসলার দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষলে হাত দাগমুক্ত হয়ে যায়।
- হাতের নখ কেটে ছোট করতে হবে। নখের মধ্যে ময়লা ঢুকলে তা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে সুস্থতায় বিঘ্ন ঘটায়।

পায়ের যত্ন : পায়ের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো—

- প্রতিদিন পা সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা ভুলে পরিষ্কার করতে হবে এবং মসৃণতা রক্ষার জন্য তেল, লোশন, গ্লিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ঈষদুষ্ক গরম পানিতে লবণ গুলে পা ৩০-৩৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে পায়ের ময়লা এবং ক্রান্তি দূর হয়।

দাঁতের যত্ন : দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো—

- প্রতিদিন মানসম্মত পেণ্ট বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করতে হবে।
- খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- দাঁত মাজার জন্য ছাই, কমলা, পোড়া মাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এগুলো ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি হয়।
- দুর্গন্ধমুক্ত উজ্জ্বল দাঁত সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

চোখের যত্ন : মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখই সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম। উত্তেজনাগ্রবণ কালিমাবিহীন, স্বচ্ছ, চকচকে চোখ সুস্থতার পরিচয় বহন করে। চোখের নিরাপত্তা বিধান নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে—

- প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- তীব্র বা উজ্জ্বল এবং কম বা নিম্নপ্রভ এই দুই ধরনের আলোই চোখের জন্য ক্ষতিকর। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- নীল বা সবুজ আলো চোখে স্লিথ অনুভূতি আনে। ক্রান্তি দূর করে।
- চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়।
- চোখ চুলকালে বা লাল হলে কিংবা পানি ঝরলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চুলের যত্ন : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যেসব নিয়মগুলো চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করে সেগুলো হলো—

- নিয়মিতভাবে চুল ঝাঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। এ জন্য অল্প ফরমুস সাবান, প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন মসুরের ডালের পানি, মেথি বাটা ও ডিমের মিশ্রণ, লেবুর রস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- খুশকি দূর করার জন্য লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।
- চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, চায়ের লিকার, টকদই ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- ‘ভিটামিন এ’ জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে।

নাক, কান ও গলা : নাক, কান ও গলা এই নিকটবর্তী অঙ্গগুলোর সুস্থতা খুবই জরুরি। শ্রবণেন্দ্রিয় কান দিয়ে কথা ঠিকভাবে শুনাই আমরা নিজেরা কথার উত্তর দিই, চিন্তা করি। ঠাণ্ডা লাগলে নাক গলা বসে গেলে কিংবা নাক দিয়ে অনবরত পানি বরলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি স্বাভাবিক জীবনেও বাধার সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট ভাষায় মিষ্ট স্বরে কথা বললে সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় ফুটে উঠে। গলার সুস্থতার জন্য শব্দযুক্ত গরম পানি ভালো।

ত্বকের যত্ন : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ত্বক উজ্জ্বল ও নীরোগ হয়। ত্বকের বর্ণ যেমনই হোক না কেন তা যদি কোমল, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দেয়। ত্বকের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন—

- নিয়মিত গোসলের অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়।
- কখনোই বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- ফরমি হীন ভালো সাবান দিয়ে প্রতিদিন গা রগড়িয়ে গোসল করা উচিত।
- গোসল কিংবা হাত মুখ ধোয়ার পর ত্বকের মসৃণতা বাড়ানোর জন্য ক্রিম/অলিভয়েল/গ্লিসারিন ব্যবহার করতে হয়।

খ) পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা—

শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতা দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন পোশাক-পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পোশাকের-পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ পোশাক মানুষের দেহের সাথে সঙ্গম ধাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সঙ্গরক্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিপাট্যের অন্তরায়। এ জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

কাছ – পরিপাট্যতার উপায়গুলো কী বর্ণনা কর।

পাঠ-৭: পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পোশাক পরিধান মানুষের মৌলিক, মানবিক অধিকার। আর ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলো ‘সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, সামর্থ্য এবং প্রবণতার সংহতি এবং ঐক্য।’ অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের জীবন্ত ঐক্য বিশেষ।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার। যেমন,

- পুরানো পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লভায় ভরে উঠে। চেহারাও উজ্জ্বলতা দেখা যায়।
- পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্বে সাক্ষীল ভাব ফুটে উঠে।
- পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনে অবস্থি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়।
- পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমকপূর্ণ নকশা বহুল, বড় ছাপা ও ভারী জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায়। কম নকশাসূত্র ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য টিলেটোলা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চক বা ডুয়ে কাপড় ব্যবহারেও দেহের উপর প্রভাব পড়ে। যেমন, লম্বা বা ঝাড়া রেখার পোশাকে খাটো মেয়েদের দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপর দিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা মেয়েদের কিছুটা খাটো দেখায়।
- দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের কীর্তা ও স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্লিম রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের মেয়েদের আপাতভাবে হালকা দেখায়। অন্যদিকে লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো ঝাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। তাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রকমের রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি রঙের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়।
- উজ্জ্বল রংক আন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আন্দদ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাধাংশে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।
- সামাজিক রীতি-নীতি ও সত্যকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করা হলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। উগ্র, অমার্জিত পোশাক সুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী।
- পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপনের জন্য সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর যেমন: জুতা, ব্যাগ, ক্রেট, কেশ বিন্যাস ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে হয়।
- পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পরিপাটি সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এসোমেদো চুল, ময়লা যুক্ত বড় বড় নখ পোশাকের মাধ্যমে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে।

অন্তর্মুখী, বহির্মুখী এবং উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের লোক রয়েছে। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা রূচিতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোকনা কেন সুরূচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরূচিপূর্ণ উদ্ভট, বেখাপা পোশাক ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করে দেয়।

কাজ – পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কীভাবে ঘটে বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ-৬: অগ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

গৃহে নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং অব্যবহৃত জিনিসের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে জীর্ণ ও পুরানো বস্ত্র অন্যতম। এসব অগ্রয়োজনীয় বস্ত্রকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন—

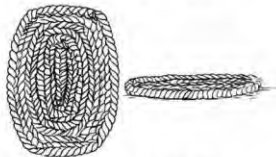
পুরানো বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদির রং চটে গেলে, সামান্য ছিঁড়ে গেলে ফেলে রাখা হয়। পুরানো কাপড়ের সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা সুন্দর করে নকশি কাঁথা বানায়। পুরানো কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতাপাতা, দৃশ্য স্ফুটনে তোলা হয়। এ ভাবে তৈরি হয় নকশি কাঁথা। বর্তমানে এসব কাঁথা শুল্ক দীভের আচ্ছাদন নয় করং বিছানার চাদর, সোফার কভার, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

পুরানো শাড়ি দিয়ে পা মোছার পাগোস তৈরি করা যায়, খাপগুলো নিম্নরূপ—

- প্রথমে শাড়ির একমাথায় পিট দিয়ে নিতে হবে।
- এবার শাড়িটিকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।
- তারপর শাড়িটিকে কোথাও স্থলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি করে শক্তভাবে বেনি করে নিতে হবে।
- এখন বেনীটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সূচ সূতা দিয়ে আটকিয়ে ফেলতে হবে।
- এই পাগোস গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হবে।

টুকরা কাপড়ের ব্যবহার :

বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করার পর বিভিন্ন টুকরা কাপড় অগ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বের হয়। বড় টুকরাগুলোকে একত্র করে একই মাপ ও একই আবৃত্তিতে কেটে সবগুলো কাপড় পরপর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্টার দিয়ে বেত কভার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



পুরানো কাপড় দিয়ে তৈরি পাগোস

কাজ – গৃহে অগ্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যবহার করে পাগোস তৈরি করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?

ক) ডিটারজেন্ট

খ) রিটার

গ) গাঁদ

ঘ) সাবান

২। বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে কাপড় থেকে সাবান ও ময়লা বের করাকে কী বলা হয়?

ক) কলপ দেওয়া

খ) হাওয়া লাগানো

গ) প্রকাশন করা

ঘ) শুবক ঘোঁতকরণ



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারীশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য